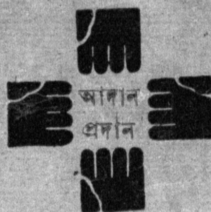


বনগরবাড়ী

ভেঙ্কটেশ মাডগুলকর

বনগরবাড়ী

ভেঙ্কটেশ মাডগুলকর

অনুবাদ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়



ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী

Original title : BANGARWADI (*Marathi*)
Bengali title : BANGARWADI

পরিবেশক
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমান্ট স্ট্রিট
কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়া দিল্লী-110016
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবজীবন প্রেস, কলিকাতা-700006 দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

'বনগরবাড়ী' সর্বপ্রথম 1954 সালে একটি মারাঠি সাপ্তাহিকের দেওয়ালি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরের বছর এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি মারাঠি পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধকালীন গ্রামীন জীবনের নিখুঁত চিত্র এই গ্রন্থে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে অতি আধুনিক থেকে প্রাচীন সমস্ত সমালোচকই এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৫৮ সালে এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ 'The Village had no walls' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাঠকসমাজের কাছে লেখক সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। ইংরাজী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন শেষ হতে চলেছে। ডেনিশ ভাষায় এর অনুবাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই গ্রন্থের কিছু অংশ আমেরিকার সাহিত্য সংগ্রহে, বিশেষ করে— 'The Teasury of Asian Short Stories : Twentieth Century Asia' গ্রন্থে সংকলিত হয়। বিশেষ করে সামন্তবাদী সমাজবাদী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ভারতের গ্রামীন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন, এই উপন্যাস তাঁদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়।

বনগরবাড়ীর চরিত্র ও বর্ণনা এত জীবন্ত হয়ে উঠবার কারণ লেখকের সহজ কথনশৈলী। গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে কোন উচ্ছ্বাস বা অতিশয়োক্তি এ গ্রন্থে একেবারেই নেই।

উপন্যাসের নায়ক একজন ব্রাহ্মণ যুবক। জীবিকার সন্ধানে সে

জীবনে প্রথম শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে মেষপালকদের গ্রাম বনগরবাড়ীতে কিছুদিনের জন্য এসেছে। স্কুল বসত ধুলো আর পাখির বিষ্ঠায় ভরা নোংরা এক বারোয়ারি ঘরে। অর্ধোন্নত রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ স্কুলটির জন্য ফার্নিচার বা শিক্ষার অন্য উপকরণ মঞ্জুর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। মেষপালকের ছেলেরাই এই স্কুলের পড়ুয়া। বাবারা ছেলেদের স্কুলে পাঠাবার সময় তাদের ভেড়াদেরও সঙ্গে দিয়ে দেয় জঙ্গলে চরিয়ে আনবার জন্য।

ওই স্কুল মাস্টারের প্রথম কাজ ছিল গ্রামের লোকদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করা। স্কুলে পড়বার বয়সী ছেলেদের একজায়গায় করে পাঠশালা চালু করা। গ্রামের প্রভাবশালী মোড়লেরা মাস্টারের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তারা মাস্টারের সমস্ত কাজে সহায়তা করত। স্কুলমাস্টার গ্রামের লোকদেরই একজন হয়ে উঠেছিল। তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে উঠেছিল। গ্রামের লোকেদের সহযোগিতায় ও নিজের উদ্যোগে সে এক ব্যায়ামাগার তৈরী করেছিল। সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান এই ব্যায়ামাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। গ্রামের লোকদের এতে আনন্দের আর সীমা থাকে না। উপন্যাসের নায়ক স্কুলমাস্টার গ্রামের প্রতিটি কাজকর্ম, ভেড়াপালন, ক্ষেত ও বাড়ির কাজ, ঋতুর ক্রমপরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু, ঝগড়া-বিবাদ, অনাবৃষ্টি ও তার পরিণামস্বরূপ দুর্ভিক্ষ সব-কিছুই প্রত্যক্ষ করে। এইসমস্ত ঘটনা পাঠকের মনে গভীর অবিচল সহানুভূতি জাগায়, সেইসঙ্গে বাইরের মানুষ গ্রামীন জীবনকে বোঝবার অনুপ্রেরণা পান। শ্রীভেঙ্কটেশ মাডগুলকর আপন আত্মাকে গ্রামীন জীবনের সঙ্গে

সহজে মিশিয়ে দিয়েছেন। বনগরবাড়ীর সাফল্যের মূল রহস্য এখানেই।

বস্তুতঃ উপন্যাসটি একটি রেখাচিত্র-সংগ্রহ। এর রঙিন ক্যানভাসে আঁকা ছবি, প্রতিটি পাঠক যার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করেন। এই উপন্যাসে কোন প্রথাসিদ্ধ নায়ক চরিত্র নেই, খল-নায়কের অপরাধ এখানে যতটুকু তাতে তার দোষ থেকে মানবিকতাটুকুই বেশী করে ছাপিয়ে উঠেছে। চোর এখানে খাবার চুরি করে কিন্তু ধরা পড়লে নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

উচ্ছৃঙ্খল ও মর্যাদাহানিকর কোন কাজ এ গ্রামে হয় না। এসব কেউ চিন্তাও করে না। তবু শেকু আর অঞ্জুর মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে অঞ্জু অন্য গ্রামের মেষপালকের সঙ্গে পালিয়ে যায় অথবা রামোশী কাছের গ্রামের এক সুন্দরী বিধবার সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

বনগরবাড়ীর ছবি ধারাবাহিকভাবে ফ্রেমে ফিট করা যায় না, আটকে রাখা যায় না। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের জীবনধারা নগরজীবনের প্রভাবে পরিবর্তিত নয়। তাদের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সব কিছুই গ্রামীন। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাদের নিজস্ব নয়। তাই স্ত্রী-পুরুষ ভাল-মন্দ সব কিছুই এখানে পুরোপুরি জীবন্ত। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও এরা নিজেদের জীবনধারা থেকে কদাচ বিচ্যুত নয়। এদের দুর্ভাগ্য কোন প্রত্যক্ষ কার্য-কারণের ওপর নির্ভরশীল নয়, তা চিরন্তন।

জন্ম থেকেই তারা মাটির কাছ থেকে পেয়েছে গ্রাম্য ভাষা যে-ভাষায় তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। লেখক এই উপন্যাসে যে গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করেছেন, তা কোন প্রভাবের দ্বারা

বশীভূত হয়ে নয়। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া তিনি কোথাও গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করেননি। আবার কখনও গ্রাম্য প্রবাদের কখনও আবার বোধগম্য সংস্কৃত শব্দ আর তার বাক্যাংশের প্রয়োগ করতেও লেখক সংকোচবোধ করেননি।

গ্রাম্যজাতির অলিখিত নিয়ম-কানুন প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরিবর্তিত রূপ। মানবজীবনের সমস্ত ভাল-মন্দের সঙ্গে গ্রাম্য-জীবনের সারল্য ঈর্ষা আর করুণার স্রোত এই উপন্যাসে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বনগরবাড়ীতে এমন অনেক নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত আছে যা প্রকৃতির অদৃশ্য কঠোর নিয়ম ও তার সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ মানব নিয়তির গভীর পরিচয় বহন করে। মারাঠী পাঠকেরা "বনগরবাড়ী"কে স্বাগত জানিয়েছে এই কারণে যে 1935 সাল থেকে লেখা সমস্ত মারাঠি উপন্যাস থেকে এই উপন্যাস ভিন্ন স্বাদের। ওয়াদেবরের 'রণনগন' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস ছাড়া অধিকাংশ মারাঠি উপন্যাস একই ঢঙে লেখা হয়েছে। রণনগনের মুখ্য বিষয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শহুরে লোকদের স্বপ্নময় জীবন-যাত্রার বিবরণ। এই ধরনের উপন্যাসগুলি প্রথম দিকে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও পরে আর পাঠকদের এসব উপন্যাস সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। পাত্র পাত্রী, নায়ক চরিত্রকে এখানে লেখকের হাতের কাঠের পুতুল মাত্র মনে হত। মারাঠি উপন্যাসের স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চার দেয়ালের সীমার মধ্যে ছিল তার পরিধি। নবীন যুগের লেখকেরা নতুন পথের সন্ধানে ব্রতী হলেন। নতুনের আহ্বান তাঁদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তাঁরা নিজেদের অর্থাৎ দরিদ্র মানুষদের মত জীবন্ত বিষয় নির্বাচন করলেন। এই নতুন চিন্তা-ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁরা

বিভিন্ন অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাহিনী সাহিত্যের উপজীব্য করে তুললেন। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এল, যখন এই আঞ্চলিকতার চিত্রণ মারাঠি সাহিত্যে একটি ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াল।

এই সময় মারাঠি উপন্যাসে নাগরিক জীবনের পিছনের সারির মানুষ, বিভিন্ন গ্রামীন জাতি উপজাতি আর অনুন্নত মানুষের বর্ণনা শুরু হল। শহরের লেখক সমাজ সহানুভূতির সঙ্গে এঁদের কথা লিখলেন। কিন্তু শুধুমাত্র সহানুভূতি দিয়েই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিভাবরী, সিরুকর, খোকন, দিখে প্রমুখ লেখকেরা অবহেলিত গ্রামীন জীবনের এমন বর্ণনা লিখে গেলেন যা পড়ে পাঠকের সত্যিই অস্বাভাবিক ঠেকে।

কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত জীবন অস্বাভাবিক হওয়া চাই। সেজন্য উপন্যাস লেখক সেই বিশেষ প্রবণতার মোহ ত্যাগ করে বাস্তব এবং সাধারণের বিশ্বাস-উপযোগী এমন লেখা লিখতে শুরু করলেন যে লেখা পড়ে গ্রামীন সমাজের সঙ্গে পাঠকও একাত্মতা বোধ করতে পারেন।

বনগরবাড়ীর মেষপালকদের জীবন কলুষিত দুঃখময় এবং ভয়াবহ। নাগরিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাইরে তাদের অধিষ্ঠান। মেষপালকদের জীবনের দুঃখ, নির্ভয়তা, দারিদ্র্য, গরীবী, অজ্ঞানতা, শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, প্রকৃতির কোপ, দুর্ভাগ্য, মানবিকতা আর ঘাস-ডালপালা দিয়ে তৈরি মাটির ঘরের নাম বনগরবাড়ী— এ-সব-কিছুর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

বনগরবাড়ী যদিও ভেঙ্কটেশ মাডগুলকরের প্রথম উপন্যাস, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামীন জীবনের পটভূমিকায় জীবন্ত রেখাচিত্রে

অঙ্কণের তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "বনতাল"এ গান্ধীজীর মৃত্যুর পর উদ্‌ভূত বিভিন্ন সমস্যা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসটি বনগরবাড়ীর মত অতটা সফল হয়নি। বনগরবাড়ীর সাফল্যের কারণ সম্ভবত কাহিনী বর্ণনায় লেখকের নৈপুণ্য আর অধিকার। শুধু মাডগুলকরই নয়, সমসাময়িক মারাঠি লেখকদের মধ্যে শ্রী এস. এস. পেন্দসে, হর্ণই, মুরুদ, আর দপোলী প্রমুখেরা পশ্চিম অঞ্চলের জনজীবনকে নিজেদের উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। পেন্দসের বর্ণিত চরিত্র শুধু গাঁয়ের নিচু তলার লোকই নয়, প্রধানত মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণ। তাঁর 'হত্তপার' উপন্যাসে বনগরবাড়ীর মতই এক স্কুল মাস্টারের চরিত্র আছে। ওই উপন্যাসের নায়ক প্রকৃত নায়কই, শুধু মাত্র উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রই নয়। অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ পাত্র-পাত্রী নিজেদের সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। তারা গ্রাম থেকে জনপদে, জনপদ থেকে শহর যায়।

বিগত পনেরো বছরের মধ্যে দ্রুত বেড়ে ওঠা শহরের জীবনের প্রতি লেখকদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। গ্রাম থেকে তাঁদের দৃষ্টি সরে ক্রমশ শহরাভিমুখী হয়। অনেক তরুণ উপন্যাসকার শহরের নীচের তলার বাসিন্দাদের নিয়ে গান লেখেন। যার মধ্যে জয়বন্ত দলবীর "চক্র", এম. এম. কর্ণিকের "মহিমচী খাদী", ভাউ পাধের "বস্থলক" প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিকরা এখানে শহর-জীবনের ফাঁকি, হৃদয়হীন জীবন তার মুমূর্ষু মূল্যবোধ আর নৈতিক অধঃপতনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এইসব উপন্যাস বিদেশী আদর্শের উদ্‌বুদ্ধ হতাশা আর নৈরাশ্যের চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু সঙ্গে এই সব লেখকেরা ভারতীয় নাগরিক জীবন আর তার

সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন। এই শ্রেণীর প্রধান প্রধান উপন্যাস হল—বালচন্দ্র সেমলোর 'কোনে' আর ভাউ পাড়ের 'বেরিস্টার অনিরুদ্ধ ধোপেশ্বরকর'।

আধুনিক মারাঠি উপন্যাসের আবার অন্য শ্রেণীও আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কবিতা আর গল্পের মত মারাঠি উপন্যাস জনতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তার ওই অকারণ মাধুকরী প্রবৃত্তি ইদানীং দূর হয়ে গিয়েছে। আজ তা নতুন পথের ঈঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও সমস্ত সাহিত্যকৃতিকে আঙ্গিকগত দিক থেকে সার্থক বলে স্বীকার করা যায় না, অনুভূতি ও পরিপ্রেক্ষিতও ওই সব উপন্যাসে যৎসামান্য, তবু বলব মারাঠি সাহিত্যিকরা এখন অধিক-মাত্রায় সচেতন। সব মিলিয়ে সৃষ্টির দিক থেকে ও আলোচনা করার মত মারাঠি উপন্যাসের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। একশো পঁচিশ বছর ধরে মারাঠি উপন্যাস এক সমৃদ্ধ, বিকশিত ও জীবন্ত সাহিত্যিক প্রতিমূর্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়ে এসেছে। এই অগ্রগতির পথে গ্রামীন জীবনের বর্ণনা-মণ্ডিত "বনগরবাড়ী" উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় অবদান।

এক

রুটির ঝোলাটা পিঠে ফেলে আমি বনগরওয়াড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

এখনও চারিদিকে অন্ধকার। আকাশে মিটি মিটি তারাগুলি জ্বলছে। আবছা অন্ধকারে শুধু গরুরগাড়ি যাবার দাগটুকু দেখা যায়। রাত কত হল, কখনই বা ভোর হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, বোধহয় বাড়ি থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়েছি। নিজের পায়ের শব্দই এখন আমার কাছে জোর শোনাচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা অবিশ্রান্তভাবে ডেকে চলেছে। কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অনেকক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে হাঁটার ফলে সারা দেহে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ছাপ।

ভয় হচ্ছে রাস্তা ভুল হয়ে গেল কিনা। কারণ এর আগে কখনও বনগরওয়াড়ী আসিনি। কি জানি, গ্রামটা কেমন, ওখানকার লোকজনই বা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, ওখানে গিয়ে কোথায়ই বা উঠব, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছি।

দু-একদিন ওখানে কাটিয়ে লোকজনের হাবভাব দেখে আবার ফিরে আসব মনে মনে এই ইচ্ছা। স্থায়িভাবে থাকার জন্য গেলে মালপত্র নিয়েই যেতাম। আজ শুধু এই পায়জামা পোষাক পরে আর দু-একটি কাপড় সঙ্গে নিয়ে চলেছি।

মালভূমির ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে যেন ছুঁচ বিঁধিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তারার আলো প্রায় নিবু নিবু। সে আলোও স্পষ্ট নয়, আবার ভোরের আলোও এখনও ভাল করে ফোটেনি। আধো আলো আধো অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ। বাতাসে ভেসে আসছে তরোতা গাছের অতি পরিচিত সুবাস। পথের ধুলোয় পা ফেললেই পা হিম হয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার কেটে গেল। সামনের দৃশ্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটু একটু করে। গাছপালা ঝোপঝাড় পাথরের টুকরো সব একটু একটু করে নজরে এল। তারাগুলি নিবে গেল। ঝিঁঝিঁ পোকার গান থেমে গেল। ঘুম থেকে উঠে কাকের দল কা-কা করে মহা সোরগোল লাগিয়ে দিল।

লাল সবুজ রঙের সূর্য মালভূমির কিনারা দিয়ে উপরে উঠে এসেছে। সবুজ রশ্মির সঙ্গে মিশেছে হলুদের ঝলক। ফুলগাছে বসা সাতবাঁয়া পাখিরা জেগে উঠেছে। লেজ নাড়িয়ে কিচির-মিচির সুরু করে দিয়েছে। গাছের ডালে পাখা ঝুলিয়ে বসে হেলে পাখীরা ডাকতে সুরু করেছে। কাকেরা উড়তে সুরু করেছে।

মালভূমির শুকনো ঘাস সূর্যের প্রথম কিরণে উষ্ণ হয়ে উঠল। ঘাসের নীচে পোকামাকড়দের জগতেও সকলে জেগে উঠছে। সার বেঁধে চলতে সুরু করেছে পিঁপড়ের দল। ফড়িংগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। গিরগিটিরা সিরসির করে এদিক ওদিক যাওয়া-

আসা করছে। গর্তের পোকামাকড়রা গায়ে মাটি মেখে লুকিয়ে ওত পেতে রয়েছে পোকা খাবার জন্য। পা ফসকে যেই তারা সামনে আসবে অমনি তারা খেয়ে ফেলবে ওই সব পোকাদের। গাছের ডালে বসে মসৃণ সবুজ রঙের গিরগিটিরা ঝুরমুট গাছের তেতো পাতা খেতে সুরু করে দিয়েছে। গর্তের ভেতর থেকে গোসাপ তার মাথা বার করে রেখেছে। গলার নিচের অংশটা বারবার দোলাচ্ছে। জিভের নাগালের মধ্যে কোন পোকামাকড় এসে পড়ে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ছেলে পাখীরা গাছের ডাল থেকে নেমে রাস্তার ওপর এসে বসেছে। সুন্দর গলা দুলিয়ে ধুলোর মধ্যে পড়া ঘাসের বীজ খুঁটে খুঁটে খেতে সুরু করে দিয়েছে। পিঠের থেকে ঝোলাটা হাতে নিয়ে এবার খুব জোরে জোরে হাঁটা সুরু করে দিলাম। খালি পা ধুলোয় লেগে ধুলো উড়ছে। পায়জামার ফত্‌ফত্‌ আওয়াজ শুনে ছেলে পাখীরা হকচকিয়ে গিয়ে সামনে থেকে এদিক ওদিক উড়ে পালাচ্ছে। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। চলতে চলতে খিদেয় পেট ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে। ঝোলার ভেতর থেকে তরকারী আর পরোটার গন্ধ নাকে আসছে। কিন্তু সেদিকে লোভ না বাড়িয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ধুলো উড়ছে ওপরে। পায়ের ওপরটাও ধুলোয় ভরতি হয়ে গেছে। পায়জামাটাও ধুলো লেগে ময়লা হয়ে গেছে। তবু পথ যেন ফুরোচ্ছে না। চারদিকে হলুদ শাদা রঙের মালভূমি। যেদিকে তাকাও সেদিকেই এই উন্মুক্ত- দিগন্ত প্রসারিত পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি রীতিমত পথিকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার ওপরে রোদ্দুর ওঠায় আরও চোখ

ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। কখনও চোখে পড়ে মালভূমির নীচের ঝোপ-ঝাড়ের সবুজ রঙ। নয়ত চারদিক পাথর আর নুড়িতে ভরা পাহাড়ি জমি। করীল, ফুল, আর বাবলা গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে চলে গেছে কোথাও চওড়া বা কোথাও সরু গরুরগাড়ি যাবার পথ। কোথাও পথ ভর্তি ধুলো, কোথাও বা পাথর বিছানো।

ধীরে ধীরে সূর্য মাথার ওপর উঠল। ভোরবেলা যে মালভূমিকে শান্ত সৌম্য বলে মনে হচ্ছিল, সূর্যের প্রখর আলোয় এখন আর তার দিকে তাকানো যায় না।

ভোরের পাখিদের কোলাহল এখন আর শোনা যাচ্ছে না। কখনও কখনও ধূসর রঙের চড়াই পাখি ওপরে উঠে তীরের মত মাটিতে ছোঁ মেরে আবার ওপরে উড়ে যাচ্ছে। কোমল বিষণ্ণ সুরে পাখিটা ডেকে চলছিল। মনে হচ্ছিল ও কী ভীষণ একা! হঠাৎ একটা উড়ন্ত বাজকে দেখে পাখিগুলো ভীষণ চিৎকার সুরু করে দিল।

দুপাশে এখন কোথাও কালো কোথাও লাল মাটি। লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কোথাও পতিত অনাবাদি জমি সূর্যের তাপে ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে। জায়গায় জায়গায় ফাটল এত বড় যে হাঁটু পর্যন্ত বসে যায়। মনে হল জমি যখন চোখে পড়েছে তখন কাছাকাছি কোথাও গ্রাম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়ি দূরে থাক একটা কুঁড়েও চোখে পড়ল না। রোদের উত্তাপ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠল। সকালবেলা যে ধুলোকে এক তাল ঠাণ্ডা কাদার মত লাগছিল, এখন তা গরমে তেতে উঠেছে। আমার মাথার ওপর একদল মাছি এসে ভন্ ভন্ করতে সুরু

করে দিয়েছে। ক্রমাগত সেই একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। মাথার টুপিটা খুলে কয়েকবার ওদের তাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তবুও ওদের নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। অতএব ওই শ' দুয়েক মাছি ভন্ ভন্ করতে করতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে স্তুরু করে দিল। ওরা বোধহয় মনে মনে ভাবছিল, লোকটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে অনেক জনবসতি আছে। সুতরাং ওর সঙ্গে সঙ্গে গেলে নিশ্চিত যে-কোন একটা লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছব। আর লোকালয়ে পৌঁছলেই নানা নর্দমা পাওয়া যাবে। ওখানে গিয়েই উঠব। এই ধারণা করেই হয়ত মাছিরা আমার সঙ্গ নিয়ে অমন ভন্ ভন্ করতে করতে উড়ে চলেছে।

দুই

চারিদিকে দিগন্ত-প্রসারিত মালভূমি। বজরার লাল ক্ষেত আর তার মাঝে শ্রীহীন বাণ্ডিলের মত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বাড়ি— এই নিয়ে বনগরওয়াড়ী। অধিকাংশ বাড়ির দেওয়াল মাটির; ছাদ ঘাস ও লতা-পাতা দিয়ে ছাওয়া। মাটি দিয়ে ছাওয়া ঘরের সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোটখাটো একটি করে বাগান।

নালার জলের ওপর কয়েকটি কচি নিম আর সজনের গাছ।

বাড়ির পিছন দিকে বাবলা কাঁটার বেড়া দিয়ে ভেড়া রাখবার জন্য একটু করে জায়গা করা। কোন বাড়ির দেওয়ালে পড়ে আছে ভাঙা গরুর গাড়ির চাকা। সমস্ত কিছুই এখানে চিরন্তন।

রাস্তা বলে কিছু নেই। বাড়ি তৈরির পর যেটুকু জমি অবশিষ্ট থাকে সেটুকু দিয়েই চলাফেরার কাজ চালানো হয়। যেটুকু জমি পড়ে আছে, সেটুকুই রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশীর ভাগ বাড়ির দরজাতেই তালা ঝুলছে। একটা বাড়ির সামনে দেখলাম দু-তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে। বাড়ির ছায়া এসে পড়েছে ধুলো ভরা রাস্তায় ওপর। সেই ছায়ায় চোখ বুজে বসে রয়েছে একটা কুকুর আর একটা লাল-কালো রঙের মুর্গি।

ডাইনে-বাঁয়ে আরও কয়েকটা বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে দরজা ফাঁক করে মেয়েরা উঁকি মেরে দেখছে। বাচ্চাগুলি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। আর একটু এগোতেই সামনে একটা মাঠ চোখে পড়ল। একটা বড় নিম গাছও দেখতে পেলাম। নিম গাছের চার দিকটায় একটা বড় ঢিবি। ঠাণ্ডা ছায়া দেখে তাপ-দগ্ধ মুর্গি যেমন কোনদিকে না চেয়ে এগিয়ে যায় তেমনি আমিও সেদিকে ছুটে গেলাম। গাছের নীচে বসে মাথার টুপিটা খুলে ফেললাম। ঘাম মুছলাম। পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেললাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘাম শুকিয়ে গেল। এখন বেশ ভাল লাগছে।

বড্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু জল কোথায় পাওয়া যাবে জানি না। জিজ্ঞাসা করার মত আশেপাশে কাউকেই দেখছি না। ভাবছি, বিনা জলেই কিছু খেয়ে নেব কি না। কিন্তু যেমন খিদে পেয়েছে তেমনি তেষ্টাও পেয়েছে; তেষ্টায় মুখের লালা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। তা ছাড়া মুখটাও নোনতা লাগছে। এই ঠাণ্ডা

হাওয়া ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছা করছে না। কাছে-পিঠের থেকে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মাথার ওপরের গাছের ডালে একজোড়া কাক বসেছিল। কিন্তু তারাও কোন শব্দ করছে না।

একটু পরে দেখলাম, আমি যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে। ভালই হল। লোকটি এলে ওকে বলা যাবে আমি কেন এসেছি। ওর কাছে একটু জল চেয়ে নেব; রুটি খেয়ে নেব। এই সব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

লোকটির মাথায় লাল রঙের পাগড়ি। গায়ে একটি জামা। ওর ধুতির ওপরে কোমরে গোঁজা একটি ছোরা উঁচু হয়ে রয়েছে। একটি হাত সেই ছুরির বাঁটের ওপর। লোকটির বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। মুখের চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উন্নত নাক। কাঁচা-পাকায় মেশানো গোঁফ। কোন সঙ্কোচ না করেই লোকটি লাল লাল চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর গোঁফে তা দিতে দিতে লোকটি মাটিতে পিক ফেলল। মনে হল, ওর পিক বুঝি আমার মুখে এসে পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি ঢিবি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকালাম।

কাশির মত ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"কে রে? ডিমওয়ালা নাকি?"

প্রশ্নটি শুনে মনে হল কে যেন আমাকে চাবুক মারল। আমি নিচে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের জন্য কোন জবাব মুখে এল না। আমার এই নোংরা পায়জামাই আমার ইজ্জৎ এতখানি ঢিলে করে দিল। খুচরা পয়সার থলি ট্যাঁকে করে গ্রামে গ্রামে ডিম কিনে

বেড়ানো কোন মুসলমান বলে আমাকে ভুল করেছে। আমি বেশ ঘাবড়িয়ে গেলাম। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লাম। নিজের চেহারা দেখে আমার নিজেরই হাসি পেল। টুপিটা ঠিক করে পরে নিয়ে আমি বললাম, "আজ্ঞে না, আমি একজন মাস্টার।"

স্পষ্টভাবে কথাটা শোনা সত্ত্বেও লোকটির কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বাঁ পায়ের ভর ডান পায়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "মাস্টার?"

লোকটির বিশ্বাসই হতে চাইছে না, নোংরা পায়জামা আর ঘরে কাচা খদ্দরের জামা পরা হাঁটুর বয়সী এই ছোকরা কী করে মাস্টার হতে পারে? যার কি না হাফপ্যান্ট পরে পাঠশালায় পড়া আর থুথু দিয়ে শ্লেট মোছার কথা সেই দুধে খোকাকে কে বলবে মাস্টার? আর বললেই বা তাকে মাস্টারির কাজ দেবেই বা কে? যত সব আজে বাজে কথা!

বয়স কম হওয়ার জন্য, তার ওপর ধুতি কোট না পরার জন্য আমারই খারাপ লাগছিল। কথায় গাম্ভীর্য এনে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি চাকরি নিয়ে; আজকেই প্রথম এসে পৌঁছেছি।"

হাতের লম্বা ছুরিটা সামনের দিকে রেখে লোকটি জোরের সঙ্গে বলল, "হুম্! তা এখানে মাস্টার কী করবে? এখানে পাঠশালা চলে কোথায়? ওয়াড়ীতে পড়ার মত বাচ্চাই বা কোথায়? সরকার কি এসব জানে না? যত সব ফাজলামির কথা।" পাগড়ি ঠিক করতে করতে লোকটি চলে গেল। যেতে যেতে আর একবার থু থু করে ধুলোর ওপর পিক ফেলে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সরু গলিটা দিয়ে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ তার দিকে

তাকাবার সাহস পর্যন্ত আমার হল না। আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ছেঁড়া নেকড়া পরে পাঠশালায় যাওয়ার সময় যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার তেমনি মনে হচ্ছিল। লোকটির ঐ একটা কথাতেই আমার সমস্ত প্রচেষ্টা আর উৎসাহ নিবে এল। ভাবলাম, উল্টো পথেই ফিরে যাই। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিই। এখানে পাঠশালা চলবে না। বাচ্চারা কেউ আসবে না। এখানে মাস্টার, পাঠশালা বা শিক্ষা কোন কিছুরই উপযোগিতা নেই বলে মনে হল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই নিমগাছের ঢিবির ওপর বসে রইলাম। এতক্ষণ ধরে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা পেয়েছিল তা সব এখন ভুলে গেলাম। রোদে পুড়ে এই গ্রামে কেন যে এলাম এখন তাই ভাবছি। নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

আর সেই সময় ক্ষেতের দিক থেকে পাকা গোঁফওয়ালা এক বৃদ্ধকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। লোকটির ভ্রূ পর্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছে। লোকটির কাঁধের ওপর জড়ানো একটি মোটা কম্বল। এক হাত দিয়ে সে কম্বলটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

জুতো পরা পা দুটিকে টানতে টানতে সে এগিয়ে আসছিল। আমার সামনে এসে থেমে গেল লোকটি। হাতটা মাথার কাছে তুলে সে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল—যেমন করে লোকে তার হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার চিহ্নটি খুঁজে দেখে। লোকটি বলল, "আরে খোকা, এখানে বসে কী করছ?" আমি বললাম, "আমি মাস্টার। আজ থেকে এখানে কাজে লেগেছি।"

"আরে মাস্টার তা এখানে বসে কেন? যাও, পাঠশালায় গিয়ে বোসো।"

বুড়োর এই কথায় আমি কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম। মনে হল, যাক, আগের ঐ পাগড়িওয়ালা লোকটির মত এ নয়।

সামনের লম্বা মাঠটার দিকে হাতের লাঠিটা মেলে সে বলল, "ওই যে দেখছ, ওটাই তোমার পাঠশালা। এই মাঠটার দুভাগই পাঠশালার জমি।"

"ওইটা পাঠশালা?"

"হ্যাঁ, যাও ওখানে গিয়ে বোসো।"

"একলা একলা বসে কীই বা করব? বাচ্চারা কোথায়?"

"বাচ্চারা সব ছাগল চরাতে গেছে। একটু পরেই এসে যাবে। জঙ্গলে তো আর সারাদিন পড়ে থাকবে না।"

"কিন্তু পাঠশালা চলার মত ছেলেকে পাব তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক আছে। আরও বাড়বে। প্রতি বছরই তো দশ-বিশটা করে বিয়ে হচ্ছে। ওদের ছেলেপুলে হবে। তুমি পড়ানোর কাজে লেগে যাও, ব্যস!"

কথাগুলো শুনে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। ঢিবি থেকে নেমে ঝোলাটা আবার তুলে নিলাম। বললাম, "একটু জল কোথায় পাব বলুন তো? তা হলে খাবারটা খেয়ে নিই। সঙ্গে পরোটা নিয়ে এসেছি।"

বুড়ো বলল, "বনগরওয়াড়ীতে জলের একটু অভাব। গরমের দিনে তো একেবারে মরুভূমিই হয়ে যায়। সামনে একটা কুয়োর মত আর ওই যে উই দেখ..."

আমি সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলাম। গ্রামের বাইরে চুনাপাথর দিয়ে বাঁধানো একটি কুয়ো চোখে পড়ল।

"আমাদের মেষপালকের জলে যদি চলে তা হলে দিতে পারি।"

আমি বললাম, "কেন চলবে না? কিন্তু ভাবছি একটা ঘটি পেলে একটু জল নিয়ে আসতাম।"

কিন্তু বুড়ো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোরগোল লাগিয়ে দিল। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "ওরে ও অনুজে। মাস্টারমশাইর জন্য এক ঘটি জল নিয়ে আয়।"

দূরের ঐ পথের ধারে একটি বাড়ি থেকে একটি মেয়ে দরজা দুটো ফাঁক করে একটু দেখে নিল। বুড়ো আবার চিৎকার করে আগের কথাগুলিই বলল। ইতিমধ্যে আমরা দুজন পাঠশালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুড়ো বলতে লাগল, "সদর মহকুমার মাস্টার আমার কাছে পাঠশালার চাবি দিয়ে গিয়েছে। যাবার সময় বলেছিল, চার্জ বুঝিয়ে দেবার মত কিছু নেই। ছেলেপুলেই নেই, এখানে কি করে পাঠশালা চলবে? এই নাও চাবি। আমি রিপোরট করে দিচ্ছি যে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি।"

পাঠশালার তালা খুললাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে ঝাপটা মেরে গেল। পাঠশালার মেঝে এবড়ো-খেবড়ো। জায়গায় জায়গায় গর্ত। ধুলো আর পাখির বিষ্ঠায় ঘর ভর্তি।

কাঁধ থেকে কম্বল নামিয়ে বুড়ো কম্বলের ধুলো ঝাড়ল। ধুলো নাকে লেগে আমার কাশি হবার যোগাড়।

কম্বলের কিছু অংশ সাফ করে বুড়ো কম্বলটা মাটিতে পেতে দিয়ে বলল, "বোসো।"

হাতের ওপর ভর দিয়ে লোকটি বসে পড়ল। লাঠিটা একদিকে রাখতে রাখতে বলল, "ওহে রুটি বার কর। ছুঁড়ি এখনই জল নিয়ে আসছে।" আমি ঝোলাটা নামালাম। পুরনো ধুতির কাপড়ে বাঁধা পরোটার থলিটা খুললাম। "আপনি একটু খাবেন নাকি

বাবা?" বুড়ো তার শুকনো চেহারায় কৌতুকের আভাস ফুটিয়ে তুলে বলল, "আরে আমি কি এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি? এর মধ্যে দুবার খাওয়া হয়ে গেছে। তৃতীয়বার খাওয়ার সময় হল। তুমি খাও।"

আমার একটু রাগ হল। কিন্তু খিদের কাছে রাগ কিছুই না। কালো মত একটা মেয়ে বাইরে দরজার কাছে এক ঘটি জল রেখে আমার দিকে এক নজর দেখে আবার চলে গেল।

এক হাঁটু লম্বা করে বুড়ো বসে বসেই কোমর থেকে বটুয়া বার করে তার মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খেতে খেতে বুড়োর দিকে তাকাচ্ছিলাম। মাথার ঐ পাগড়ি আর পরনে আধখানা ধুতি ছাড়া লোকটির দেহে আর কিছুই নেই।

মেঠো জমিতে ভেড়া চরাতে চরাতে মাটির রঙ আর ভেড়ার মেটে রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তার গায়ের রঙটাও কুচকুচে কালো হয়ে উঠেছে। রোগা পাকানো শরীর। খালি পায়ে থাকার ফলে ঝোপ-ঝাড়ের কাঁটা ফুটে ফুটে তার পা শাদা হয়ে গেছে। লোকটি একেবারে থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেছে। পায়রার পায়ের মত ভুরু, শাদা গোঁফ, আঙুলের সমান লম্বা লম্বা দাড়ি আর মাথায় শাদা কোঁচকানো চুল। বয়স কত অনুমান করা শক্ত। ওর শরীরে ক্লান্তির ছাপ, হাত-পায়ের শিরা বেরিয়ে পড়েছে।

মুখে তামাক পুরে, তামাকের কৌটোটা ঠিক করে রাখতে রাখতে সে বলল, "মহাশয়ের নিবাস কোন্ গ্রামে?" আমি বললাম, "পাশের গ্রাম—বিভূতিবাড়ি।"—"কোন বাড়ির ছেলে বলো তো?" আমি সব পরিচয় দিলাম। বুড়ো অনেক চেনাজানা লোকের

নাম জিজ্ঞাসা করল। বলল, "তুমি তাহলে আমাদেই ঘরের লোক।" এই কথা বলে আমার পিঠে হাত রেখে বসে বসেই সে দরজার দিকে পিক ফেলার জন্য মুখ বাড়ালো।

আমার সাহস বেশ বেড়ে গেল। মনে হতে লাগল, এই মেষ-পালকদের গ্রামে আমি একেবারে একা নই। কাছে এসে নিজের মত করে নেবার মত লোকও এখানে আছে। নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলার মত লোকও কেউ-না-কেউ পাওয়া যাবে। এরকম দশ পাঁচজন লোক পাওয়া গেলে মোটের ওপর এখানে থাকা অসহ্য হবে না বলে মনে হল।

একটু পরে বুড়ো বিদায় নিয়ে খেতে চলে গেল। আমার ভীষণ একা একা লাগতে লাগল। পাঠশালার দেওয়ালে আগের মাস্টারমশাই খড়ি দিয়ে অনেক শ্লোক লিখে রেখেছেন। ঘরের পূর্ব-পশ্চিম দিকে মাস্টারমশাইর নামের ফলক ঝুলছে। ছাদের ওপর লিসৌড়া গাছের একটি ডাল এসে পড়েছে। তার ওপর বসেছিল মশার দল। ছাদের ফোকরে যেখানে জায়গা পেয়েছে সেখানেই পাখিরা বাসা বেঁধেছে। তার মধ্যে থেকে শণের দড়ি আর আগাছা ঝুলছে। পাখিরা চারদিক থেকে কিচির মিচির লাগিয়ে দিয়েছে। পাঠশালার উপকরণের মধ্যে একটা টেবিল, একটি চেয়ার, একটি বোর্ড। টেবিলের সঙ্গে আঁটা একটি ড্রয়ার। সেটি খুলে দেখলাম তার মধ্যে রয়েছে, বোর্ড মোছার ন্যাকড়া, পুরনো হাজিরা খাতা, রেজিস্টারি খাতা, চকের খালি বাক্স, দোয়াত কলম, আরও কিছু হাবিজাবি জিনিসপত্র।

ঝোলা থেকে চাদরটা বার করে মেঝের ওপর বিছিয়ে ফেললাম।

মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য কাপড়ের খুঁটের এক ভাগ মাথায় জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

এরকমভাবে একলা থাকলে কোন ঝুট-ঝামেলাই নেই। কিন্তু যেখানে কোন জন-মনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই, সারা গ্রাম রোদে খাঁ-খাঁ করছে, এইরকম গ্রামে এই শূন্য পাঠশালায় আমার নিজেকে বড় বেশী নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। পাখিরা ডেকেই চলেছে। একটা আধটা কিচির মিচির শুনলে ভালই লাগে। কিন্তু দশ-পাঁচটা পাখি একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করছে শুনে দম বন্ধ হবার দাখিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর কোন প্রতিকারের পথ নেই। দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাও দেওয়ালের ওপার থেকে সেই আওয়াজ ঘরে এসে পৌঁছাতে লাগল। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। একে অতখানি পথ হেঁটে এসেছি, তারপর দুপুরের খাওয়াটাও হয়ে গিয়েছে—এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আমি তলিয়ে গেলাম।

তিন

এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে খোলা দরজা দিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। দিন শেষ হয়ে এসেছে। জঙ্গল থেকে ভেড়াদের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, তবুও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। কেননা,

পা দুটো ব্যথায় টনটন করছে। হাত দুটো মাথার নীচে দিয়ে ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে ওখানে আরও কিছুক্ষণ পড়ে রইলাম।

বাইরে ভেড়াদের শোরগোল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আশপাশ থেকে মেষপালকদের ডাক শোনা যেতে লাগল। তাদের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে। কাক-পক্ষীরা ডেকে চলেছে। কিছুক্ষণ আগে দ্বিপ্রহরের সেই নির্জন গ্রাম এখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উঠেছে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে।

আমি বাইরের মাঠে এসে দাঁড়ালাম। যে রাস্তা ধরে আমি এসেছিলাম, পাগড়িওয়ালা লোকটি এসেছিল, ওই বুড়ো এসেছিল, সেই পথটি ঘরমুখো ভেড়াদের ভিড়ে ভরে গিয়েছে। নিচের দিকে গলা ঝুলিয়ে ভেড়াগুলি তাড়াতাড়ি হাঁটছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আওয়াজ উঠছে। ধুলো উড়ছে। ধুলোর ওপর শত শত খুরের দাগ পড়ছে। আর কোমর থেকে খুলে পরা ধুতি সামলে মিশমিশে কালো রঙের মেষপালকেরা কাঁধে লাঠি নিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে তাদের পিছনে পিছনে আসছে। ওই ভেড়াদের লাইনে ছাগল আর কুকুরও রয়েছে।

পশ্চিমের আকাশ কি লাল হয়ে উঠেছে এতক্ষণে? পুব দিক থেকে হাওয়া বইছিল। শাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ পশ্চিমের লাল আকাশ থেকে পুবের নীল কালো আকাশের দিকে ছেয়ে যাচ্ছে। নীচের মত আকাশের বুকেও কে যেন একদল লাল-শাদা ভেড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভেড়ার দল দৌড়তে দৌড়তে চলেছে। তাদের আট-দশ দিনের বাচ্চারা বাড়িতে। বাচ্চা ভেড়ারা দুর্বল পায়ে টলমল

করতে করতে চলছে আর গোলাপী জিভ বার করে কাতর স্বরে ডাকছে। ভেড়াদের আসতে দেখে বাচ্চারা ছুটে গিয়ে তাদের কোলের মধ্যে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারতে সুরু করেছে।

জঙ্গল থেকে ফিরে মেষপালকরা উনান ধরালো। ঘাসের ছাদ ভেদ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগল আকাশের দিকে। মেষপালকরা ভেড়াদের গোয়ালে বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে ঘন অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল। ভেড়াদের শোরগোল, পাখিদের কলকাকলি, মানুষের কলরব, সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

পাঠশালার বাইরে ঢিবির ওপর আমি পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করে জ্বলছে। নীচে বাড়ি বাড়ি জ্বলছে প্রদীপ শিখা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হিমেল স্পর্শ।

এর মধ্যে অন্ধকারে কে একজন এসে সামনের হনুমানজীর মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল। একবার ভাবলাম যাই, ওই প্রদীপের আলোয় গিয়ে বসে রুটি খেয়ে নেই। মেয়েটি একটি ঘটি করে যে জলটুকু দিয়ে গেছে, ওই জল খেয়ে তেষ্টাটা মেটাই। কিন্তু আমার শরীরে আর কুলোচ্ছে না। উঠতে একদম ইচ্ছা করল না। থামের গায়ে হেলান দিয়ে ওইখানে বসে বসেই অন্ধকারের রূপ দেখতে লাগলাম।

আজ থেকে আরও তিন বছর এটাই আমার গ্রাম। এখানেই আমাকে থাকতে হবে। এখানকার লোকজনের সঙ্গেই আমাকে মেলামেশা করতে হবে।

তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে হবে, ভালবাসা জাগাতে হবে। পাঠশালায় পাখিদের বিষ্ঠা আর মশাদের বাসা রোজ আমাকে

পরিষ্কার করতে হবে। পাঠশালার পড়ুয়াও জোগাড় করতে হবে। পাঠশালার প্রতি তাদের আগ্রহ জাগাতে হবে। নিজে গ্রামে থেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে। কিন্তু এসবের সবচেয়ে বড় বাধা আমার অল্প বয়স আর পাতলা রোগা চেহারা। আর এটি এমনই এক অজ পাড়াগাঁ যে আজ পর্যন্ত পাঁচ-দশটা ছেলেও নিয়মিত পাঠশালায় আসে না। কী জানি কেমন করে সব হবে!

সামনের দিক থেকে পায়ের শব্দ কানে এল। হনুমানজী মন্দিরের প্রদীপের ক্ষীণ আলোর সবুজ লাল রঙের ছটা বাইরে এসে পড়েছিল। সেই আলোয় দেখা গেল সামনে এক কালো মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু এটুকু দেখতে পেলাম, কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বুকে একটু বল এল। "কে, মাস্টার বসে আছ নাকি?" গলার আওয়াজ শুনেই চিনলাম— বুড়ো বাবা।

"হ্যাঁ, আসুন, আসুন।"

"রুটি খাওয়া হয়েছে?

"না। এখনি খাব।"

"এই নাও, একটু ছাগলের দুধ এনেছি।"

ঢিবির ওপর বাসন রাখার শব্দ হল। সামনে হাত বাড়াতেই বাসনে গিয়ে হাত ঠেকল।

এর মধ্যে আর একজন কে এসে একটু কেশে সামনের ঢিবির সিঁড়ির ওপর বসল।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "কে ওখানে?"

"আমি, মুখিয়াজী—"

"আনংদা?"

"হাঁ।"

"আরে উল্লুক, মাস্টারমশাই সেই থেকে অন্ধকারে বসে আছে। যা, একটা হ্যারিকেন নিয়ে আয়।"

"কোন্ মাস্টার?"

বুড়োকে আবার গোড়া থেকে আমার পরিচয় দিতে হল। কোন মাস্টার, কেন এসেছে, কোথাকার মাস্টার? কার ছেলে? মুখিয়া সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল। আনংদা সব শুনে একটা হ্যারিকেন নিয়ে আসতে গেল। ঘটি গেলাস, বাতি, বিছানা সব-কিছুরই দরকার ছিল। এগুলো আমার সঙ্গে করেই আনা উচিত ছিল। কিন্তু একদম খেয়াল ছিল না। আনংদা রামোনী লণ্ঠন আনতে গেছে। এর মধ্যে আরও দশ-বারো জনের মত লোক এসে গেছে। ধুলোর ওপর কম্বল বিছিয়ে সবাই বসে গেছে। কথাবার্তার মাধ্যমেই একে অপরকে চিনে নিয়েছে। কার একটা ভেড়া শিয়ালে নিয়ে গেছে। তার জন্য তফশীলে নালিশ করা হয়েছে। এক শিয়ালী কার বাড়িতে গিয়ে বাচ্চা পেড়েছে। শিয়ালীটা কাছে পিঠে কোথাও রয়েছে। রাত্তির বেলা গিয়ে বাছাধনকে পেটালে বুঝবে মজা! এই সব নানান কথা ওরা বলাবলি করছিল। কেউ আবার এ-কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিল। কেউ আবার বলল, জানোয়ার এমন করে ধরা যায় না। ওরা সব সময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যখন এই সব কথা হচ্ছে তখন একজন খবর নিয়ে এল, শিয়াল নয়, ভেড়াটাকে যে জানোয়ার নিয়ে গেছে সেটি একটা কুকুর। আর কুকুরটার মালিক হচ্ছে ফলাং ফলাং। ফলাং ফলাং এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। পাগড়িটা হাতে করে আনংদা রামোনী হ্যারিকেন নিয়ে এল। হ্যারিকেনের

আলোয় দেখলাম জন দশ-বারোর মত লোক মাটিতে বসে। কারও গায়ে জামা নেই। প্রত্যেকের কাছেই একটা করে মোটা কম্বল। কেউ বা সেটি ভাঁজ করে তার ওপরেই বসে আছে, কারও বা আবার গায়ে জড়ানো।

পাঠশালার ভেতর ঢুকে আনংদার লণ্ঠনের আলোতে বসে খেয়ে নিলাম। তারপর বাইরে এলাম।

মুখিয়া জিজ্ঞাসা করল, "খাওয়া হল?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

কথাবার্তা ও গলা খাঁকারির শব্দে মনে হল মজলিশ বেশ জমে উঠেছে। একবার মনে ভাবলাম পাঠশালার ভেতর থেকে হ্যারিকেনটা বাইরে নিয়ে আসি, কিন্তু হাওয়ার চোটে বাইরে বেশীক্ষণ রাখাও যেত না। আর তা ছাড়া আমি ছাড়া বাইরের আর কারও আলোর দরকারও নেই। আমার সামনে বসা এই বুড়ো যে আমাকে খোকা বলে সম্বোধন করেছিল, সে যে গ্রামের মোড়ল বা মুখিয়া তা বেশ বুঝতে পারলাম। কারণ মজলিশের সকলেই তাকে মুখিয়াজা বলে ডাকছে।

মজলিশের অদৃশ্য লোকদের উদ্দেশে একটু পরে মুখিয়া বলল, "আরে মাস্টার এসেছে। কাল থেকে বাচ্চাদের পাঠশালায় পাঠাও।"

কে যেন কেশে থুথু ফেলল।

কে একজন ফিস ফিস করে পাশের একজনকে বলল, "গ্রামে বাচ্চা কোথায়?" বুড়ো বেশ চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কেন, সবাই কি যমের বাড়ি চলে গেছে নাকি?"

"না তা নয়। তবে পাঠশালায় পড়বার মত ছেলেপুলে কোথায় বলুন?"

"একজনও নেই ? তাহলে সবাই কাজে লেগে গেছে, তাই বল !"

কিছুক্ষণের মধ্যে নানান রকমের প্রশ্ন সুরু হয়ে গেল। আমি বললাম, "ছ' বছরের ওপর যে সব বাচ্চারা ছাগল চরাতে যায়, তারা কি একলা যায় ?"

"তা না হলে আবার কী ? জঙ্গলের মধ্যে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঘোরে, ছোট হলে দু·তিনজন মিলে একসঙ্গে যায়।"

"তবে এই সব ছেলেদেরই পাঠান না। তারা একটু লেখাপড়া শিখলে লোকসান হবে না, বরং লাভই হবে।"

মুখের ভেতর তামাক পোরা গলায় কে যেন দূর থেকে বলল, "ওদের তাহলে পেট চলবে কী করে ?"

এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না। বাচ্চারা যখন পাঠশালায়, পেট কী করে চলে এটি আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম মা-বাবাই রোজগার করে বাচ্চাদের খাওয়ায়। কিন্তু বুড়ো নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিল। সে বলল, "না খেয়ে মরলে আমার কাছে এস। এক সের দু সের জোয়ার যা পারব দেব। পাজীর পাঝাড়া! যে কাজ বলব সে কাজেই বাগড়া দেবে। সরকার ভাল পাঠশালা করে দিয়েছে, ভাল মাস্টার দিয়েছে, তা লেখাপড়া শেখাতে তোমাদের কী ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি ?"

ব্যস, এই একটা কথাতেই মজলিশের সুর পালটে গেল। কে কে ছেলেপুলেদের পাঠাতে পারবে সেই নিয়ে কথা সুরু হল। আমার সদা যাবে, আমার মহাদা যাবে, আপনার তুকা আসবে, ওর সখা আসবে— এই করতে করতে দেখা গেল তা দশ-বারোটা বাচ্চা হয়ে গেছে।

মুখিয়াজী বলল, "মাস্টার, তোমার মনের মত হয়েছে তো এবার ?

তাহলে কাল থেকে কাজে লেগে যাও।" এইভাবে প্রসঙ্গ এক সময় শেষ হল। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। লোকজন এই উঠছে, এই উঠছে ভেবে আমিও অনেকক্ষণ বসেছিলাম। এরপর আরও নানারকম প্রসঙ্গ এসে পড়ল। বর্ষা, জল, মাঠ, ময়দান, ভেড়া— তোমারটা কীরকম, আমারটা এই রকম, এই সব নানান কথা শুরু হয়ে গেল।

আমি এক সময় চুপি চুপি মুখিয়াজীকে বললাম, "আমি এবার শুতে যাব?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ শুয়ে পড়। বাচ্চারা কাল ভোরেই এসে যাবে। কোন চিন্তা কোর না।"

ভেতরে গিয়ে চাদর বিছিয়ে ধুতিটা গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিলাম, বাইরে কথাবার্তা তখনও চলছে। এক সময়ে চোখ ঘুমে বুজে এল।

মাঝখানে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, চাঁদ উঠেছে। মজলিশের কিছু লোক সামনের মাঠে, আর কিছু লোক সেই ছোট্ট ঢিবিটার ওপর যে যেমন বসেছিল, তেমনিভাবেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

স্বচ্ছ আকাশ। সুন্দর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের এই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। সামনে গাঁয়ের এক প্রান্তে দুটো খোড়ো ঘর, তাদের ছায়া এসে পড়েছে মাটিতে, ওপাশে যতদূর দেখা যায় উন্মুক্ত অরণ্য। দূরে আবছা ঝোপঝাড় নজরে পড়ে। আজ দুপুরে প্রচণ্ড রোদ্দুরের সময় যেখানে এসে বসেছিলাম সেই নিমগাছটি কেমন শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মগডালে গোটাচারেক শাদা বক চুপচাপ বসে।

চার

প্রায় আট-দশ দিন হল এখানে এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাঠশালায় কোন নিয়মিত পড়ুয়া জুটল না। পাঠশালা চলছে না। কোন-কোনদিন দু চারজন বাচ্চা যা-ও আসে, তা-ও আবার এক-ঘণ্টা আধঘণ্টার মধ্যে চলে যায়। প্রস্রাবের ছুতো করে বাইরে যায় আর ফিরে আসে না। তার মধ্যে দু-একজন যারা নিয়মিত আসে, কখনও তাদের বাবা, অথবা কখনও তাদের মা রুটি খাবার নাম করে ডেকে নিয়ে জঙ্গলে ছাগল চরাতে পাঠিয়ে দেয়।

কোন ছেলে দুষ্টুমি করলে তাকে বকার যো নেই। অমনি সে সঙ্গে সঙ্গে কান্না সুরু করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মা ছুটে এসে বলবে, "আরে বাবা, তোমার কি ছেলেপুলে নেই? নিকুচি করেছে তোমার পাঠশালার! চল বাবা, বাড়ি চল।" এই বলে ছেলের হাত ধরে বাড়ি চলে যাবে।

এইভাবেই চলছিল আমার পাঠশালা।

রোজ সন্ধ্যার সময় সেই মাঠের ঢিবিটার ওপর গ্রামের লোকেরা এসে মজলিশ বসাত। তাদের কাছে এ কথা বললে, বলত, "এখনও বাচ্চাদের অভ্যেস হয়নি। পনেরো দিন কি একমাস যেতে দাও।"

যেতে না দিয়ে আমারই বা কি করার ছিল?

এর মধ্যে মুখিয়াজী আমাকে একটি ছোট ঘর দিয়েছে। তার মধ্যে আমি আমার সংসার সাজিয়েছি। পাথর দিয়ে উনান তৈরি করেছি। রবিবার গ্রামে গিয়ে দু-একটি থালা বাসন নিয়ে এসেছি। এখন নিজেই রান্না করে খাই।

একদিন রাতে একটা ছোরা হাতে করে দাদু এল। হ্যারিকেনের আলোর ছটা এসে পড়া বিছানাটার ওপর আমি তখন বসে। ও এসে হাতের ছোরাটা দেওয়ালের এক কোণে রেখে দিয়ে বলল, "আর বল কেন, তোমার জন্যই এখানে আসতে হল।" বলে সতরঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে গেল।

এখন গ্রাম্য চাষাড়ে ভাষা আমার কিছুটা রপ্ত হয়ে গেছে। ভদ্রভাবে কী করে কথা বলতে হয় লোকটি তা জানেই না। যদি সে ভালবেসে, স্নেহ করে বা বিশেষ পরিচিত বলে ঠাট্টা-তামাশার সুরে কথা বলত তাহলে বোধহয় অতটা খারাপ লাগত না। কিন্তু যখন কোন অপরিচিত অচেনা মেষপালক 'কি রে মাস্টার' বলে ডাকে তখন আমার ভীষণ খারাপ লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, দাদুর ওই সুরে সম্বোধন আমার খুব বিশ্রী লেগেছিল।

পকেট থেকে একটা কল্কে বার করে তার মধ্যে তামাক ভরতে লাগল দাদু। যাতে পড়ে না যায় তারজন্য পায়ের আঙুলের ফাঁকে কল্কেটা ধরে রেখে হাত দিয়ে আগুন ধরাতে লাগল। আগুন কল্কের ওপর রেখে কল্কেতে টান মেরে খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরিয়ে তুলল।

পেটে কড়া ধোঁয়া ঢুকে যাওয়ার ফলে তার চোখে জল এসে গেল।

প্রথম সাক্ষাতেই লোকটির প্রতি আমার মন বিষিয়ে গেল। কথাবার্তার পর আমি বুঝতে পারলাম, লোকটি একটি পুরো

ধান্দাবাজ। গ্রামের লোকদের ওপর লোকটির বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তার ওপর তহশীলের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ওর যথেষ্ট দহরম মহরম। কিছু লেখাপড়াও জানে। এ কারণে গ্রামের লোক মাঝে মাঝে ওর পরামর্শ নিয়ে থাকে।

নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে কল্কেটা নিবিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "তোমার আগের মাস্টার এই ঘরেই ছিল। সে কিছু অন্যায় করেছিল বলে খুব মার খেয়েছিল। গাঁয়ের লোক তাকে খুব পিটিয়েছিল। এসব খবর আমি উড়ো উড়ো শুনেছি। সে কথা মনে হতেই আমার মনে মনে ভীষণ ভয় করতে লাগল। তবু আমি মুখের চেহারায় তা প্রকাশ না করে বললাম, "তাই নাকি ?"

ভেড়া ভয় পেলে যেমন ডাকে ঠিক সেই রকম শোনাল আমার গলার আওয়াজ।

"মেজাজ দেখিয়ে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়েই দাদাগিরি সুরু করে দিয়েছিল। বদমাশটা আমার অন্দরমহল পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। আমি দু' তিনবার তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমার ঘরের বৌ-মেয়েদের দিকে নজর দিও না; তাহলে কিন্তু ভাল হবে না। কিন্তু আমার কথা সে শোনেনি। ও ভেবেছিল, আমি সরকারি চাকুরে, আমার আবার ভয় কি ? ভেবেছিল, এই মুখ্যু ভেড়া-চরানি আমার কী করবে। তাই বেচারা মিছিমিছি মারা পড়ল।"

কথা বলার সময় তার ওই বিশ্রী চেহারাটি খুশীর দমকে ভরে গেল। লাল ভাঁটার মত চোখে সে আমার দিকে তাকাল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বসে রইলাম।

কোণে রাখা ছোরাটা নিয়ে এসে সে এবার নিজের পাশে রাখল আর বলল, "এরকম সেও বসেছিল ঠিক এইরকম সময়ে। আমি এসে এই ঘরে ঢুকলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করেনি। সোজা এই ছোরাটার উলটো পিঠ দিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগলাম, যতক্ষণ না সে মাটিতে পড়ে গেল। ওর কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে গেল। লোকটি আমার পায়ে পড়তে লাগল। কিন্তু আমি তখন খুব রেগে ছিলাম। দশ-পাঁচ ঘা মারার পর সে যখন মাটিতে মড়ার মত পড়ে রইল, তখন বললাম, "গ্রামে গিয়ে চুপচাপ করে বাচ্চাদের পড়াও। বদমাইশি করলে একেবারে জানে মেরে দেব।"

হ্যারিকেনের লাল আলো বনফুসকের হাড়গিলের মত মুখের ওপর এসে পড়েছে। ওর লম্বা লম্বা অগোছাল গোঁফ, বিড়ি-খাওয়া কালো ঠোঁট নীচের বড় বড় দাঁতগুলোকে চেপে রেখে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কী বলব! নিজের অজান্তেই হী হী করে হেসে দরজার দিকে তাকালাম। এ সময় কেউ একজন এসে পড়ুক মনে মনে চাইছিলাম। গোঁফ পাকাতে পাকাতে দাদু বলল, "মাস্টার, হেসো না। হাসির কথা নয়। তুমি নতুন এসেছ। নিজের কাজ ঠিক করে কর। গাঁয়ের ভিতরে পা বাড়িও না, পাঠশালায় বাচ্চারা এলে তাদের পড়াও। গ্রামকে কিছু জ্ঞান দিতে যেও না।"

মেঝের ওপর রাখা কল্কে, দিয়াশলাই জামার পকেটে রেখে অস্ত্রটা উঠিয়ে বুক উঁচিয়ে সে বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। গা-মাথা ঘামে ভরে গেছে। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার খিল বন্ধ করে দেব কিনা ভাবছি, কিন্তু সে কাজ আমার দ্বারা হল না।

ঘরের মধ্যে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। খোলা দরজা দিয়ে কেউ ভেতরে আসছে মনে হল। আমার ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠল। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। ঝট্ করে উঠে বসে সামনের দিকে তাকালাম। বাইরের অন্ধকারে বিশ-বাইশ বছরের এক হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান দরজার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। তাকে আমার চেনা কেউ বলে মনে হল না। আজ পর্যন্ত এ গাঁয়ে তাকে কোনদিন দেখিনি।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে তুমি?"

"আমি আয়বু।"

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বর্ষায় ভেজা কুকুরের মত ভেতরে এসে বসা এই আয়বু কে? আমার মাথায় কিছুই আসছে না। কিন্তু সে দু' হাঁটু এক করে হাঁটুতে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকালো। হ্যারিকেনের আলোতে ওর ছোট ছোট চোখ আর হাসি হাসি মুখখানি আমি দেখতে পেলাম।

"তুমি কি এই গ্রামের?"

"না। এখতপুরের।"

"এখতপুর? তাহলে তো অনেক দূর থেকে এসেছ। কার বাড়িতে উঠেছ?"

, আয়বু মাথার উপর থেকে টুপিটা নামিয়ে রাখল।

দুটো হাত জোড় করে ঘরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমার কেউ নেই। পেট চালবার মত খাবারের জোগাড় করতে গ্রামে

গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ এই গ্রামে এসে পৌঁছেছি। পাঠশালার কাছের লোকেরা বলল, 'মাস্টার একলা থাকে। ওর সঙ্গে গিয়ে থাক।' তাই চলে এসেছি।"

আমার মনে হল ওর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের, অনেক বছরের। ফোলা ফোলা গাল, লাল নাক, এই আয়বু কেন ঘুরে বেড়ায়, কেমন করে সে বেঁচে আছে আমার মাথায় এল না। আমি ওকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই করতে পারলাম না, নিজের গ্রাম কেন ছাড়লে, ঠিক এখানেই বা কীভাবে এলে? এখন কী করবে? কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু তোমার কাছে নেই কেন?

গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর মুসলমানি পায়জামা পরা এই আয়বুর সঙ্গে আমার বেশী কথা হল না। সকালে খাওয়ার জন্য যে রুটি রাখা ছিল তার থেকে একটি রুটি বার করে তার মধ্যে লঙ্কা আর তেল দিয়ে ওর হাতে দিলাম। যেমন বসে ছিল তেমনি ভাবেই বসে রুটিটা অল্পক্ষণের মধ্যে সে খেয়ে ফেলল। চপ চপ করে খাওয়ার শব্দ একসময় থেমে গেল। ঘটি করে জল দিলাম। সে অঞ্জলি ভরে খেল। তারপর দরজার বাইরে কুলকুচো করে ফেলল। দেওয়ালের দিকে ঘটিটাকে উপুড় করে রেখে দিয়ে হাতের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বসে পড়ল।

বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে আরও পাঁচ-দশ মিনিট কড়ির কাঠ গুণতে লাগলাম।

আয়বুর নাক ডাকার শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঐ অবস্থায় হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সে শুয়ে পড়ল। আশ্রয় পেয়েছে। জল-

খাবার মত রুটি পেয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। আমি নীচের কম্বলটা বার করে আয়বুর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। গায়ে পড়ামাত্র ও জেগে উঠল। বড় বড় চোখ করে একবার আমার দিকে আর একবার কম্বলটার দিকে তাকাল। আমি চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছি দেখে সে কম্বলটা নিয়ে নিল। অর্ধেকটা পেতে আর অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে, দুধ-ভাত খেয়ে বেড়াল যেমন আরামে শুয়ে পড়ে, তেমনিভাবে শুয়ে পড়ল। একটু বাদে সে নাক ডাকাতে সুরু করে দিল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, অস্ত্র নিয়ে যারা চলাফেরা করে তাদের আর ভয় করব না। আসলে আমি মানুষটা মোটেই ভীতু প্রকৃতির নই। এ জীবনে ভাল-মন্দ উভয়ের সঙ্গেই আমার ভালভাবে মোকাবিলা হয়েছে। আর পাঁচজন সাধারণ ছেলেপুলের চেয়ে আমি একটু ভালভাবেই জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কিন্তু সে সব থেকে বর্তমানের এই অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন ধরনের। এই জন্যই প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন তার ঠিক উলটো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যার ফলে আমার মধ্যে প্রচণ্ড সাহস এসে গিয়েছে। তাই হাওয়া আসার জন্য দরজা খোলা রেখে আয়বুর মত সাহসী মন নিয়ে আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

পাঁচ

বনগরওয়াড়ীর বেশীর ভাগ ঘরই ছিল মেষপালক। কালো তেল-চিটচিটে রঙের মেষপালকরা সব সময় খালি গায়েই থাকত। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তারা বেশী কিছু জানত না। তাদের কোন অনুভূতিও ছিল না। তারা খুব ভোরে উঠে গোয়ালে রাতভর বাঁধা ভেড়ার পালদের খুলে বার করে নিয়ে গ্রামের বাইরে চলে যেত। তিন মাইল দূরে এক গোচারণ মাঠ ছিল। ওরা ভেড়াদের সেখানে নিয়ে যেত। শত শত ভেড়ার পেছনে একজন করে রাখাল আর একটা কুকুর থাকত।

ঘাড় নীচু করে ভেড়ার দল ঘাস চিবোতে চিবোতে এদিক ওদিক চরে বেড়াত। অনেক জাতের ঘাসের বীজ তাদের গায়ের লোমের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে বহু দূর দূর চলে যেত। পরের বছর আবার সে-সব জায়গায় ঐ বীজ থেকে ভেড়াদের খাবার উপযোগী নতুন ঘাসের জঙ্গল গজিয়ে যেত। কাঁধে লাঠি নিয়ে মেষপালকরা ভেড়াদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। সারাদিন ধরে তারা কড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের কুকুরগুলো পর্যন্ত হাঁফিয়ে উঠত। লাফিয়ে লাফিয়ে চলা ফড়িংদের অনুসরণ করত, আবার কালো গিরগিটিদের পেছনে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাড়া করে তারা তাদের ক্লান্তি দূর করত। মেষপালকদের অবস্থাও তথৈবচ।

কখনও কখনও তারা একটি তেজী ভেড়াকে বেছে নিয়ে তার গলায় ঘুঙুর বেঁধে দিত। রুটি খেতে বসলে ভেড়াটির মুখে এক টুকরো রুটি দিত। ফসল উঠলে দু-এক টুকরো ভুট্টা ভেঙে খাওয়াত। এর ফলে ভেড়াটি কুকুরের মত তাদের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াত। এই সব শেখা হয়ে গেলে যখন অন্য ভেড়ারা মাঠে মাঠে চরে বেড়াত তখন মেষপালকেরা মজা করার জন্য সেই ভেড়াটিকে লাঠির তালে তালে নাচ শেখাত। তাকে বসতে বললে বসত, আবার উঠতে বললে উঠে দাঁড়াত। এ সমস্তই তার সহজে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারা কখনও হাতের কুঠার দিয়ে বাবুল গাছের ডাল কাটত, কখনও আবার জাল পেতে পায়রা ধরত।

এইভাবেই ভেড়ারা চরত আর যারা তাদের চরাত তাদেরও সময় কাটছিল এইভাবে।

কিন্তু মেষপালকদের এমন একা থাকতে হত কদাচিৎ। কারণ মাঝে মাঝেই তিন-চারজন মেষপালক একসঙ্গে তাদের ভেড়া চরাত। দুপুর হলেই কুয়োর ধারে গিয়ে স্নান সেরে নিত। রোদের তেজ বাড়তে থাকলে ভেড়ারাও ক্লান্ত হয়ে জলের সন্ধানে যেত। শুকনো নালার শ্যাওলার নীচে ঝিরঝির করে বয়ে চলা জল খেয়ে তারা সুস্থ হয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করত। মেষ-পালকরাও তখন গাছের ছায়ায় রুটি খেতে বসত।

খাওয়াদাওয়ার পর দু-একজন জেগে থাকত, আর বাকীরা দু-তিনটি কম্বল বিছিয়ে পাগড়ি দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে থাকত। আর তাদের কুকুরগুলো তখন ভিজে ঠাণ্ডা বালুর ওপর শুয়ে শুয়ে হাঁফাত।

দিনের আলো থাকতে থাকতে মেষপালকরা ভেড়াদের নিয়ে গাঁয়ের পথ ধরত। ফেরবার পথে মালভূমিতে যা খাবার জিনিস পেত তা চিবুতে চিবুতে গাঁয়ে এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যেত।

গ্রামের কাছে এসে পড়লে এক-একটি মেষপালক আলাদা আলাদা দাঁড়াত আর নিজের নিজের ভেড়াদের ডেকে নিত। একটা দল থেকে তখন অনেকগুলো ছোট ছোট দল হয়ে যেত।

স্বামীরা মাঠে চলে গেলে বউরা চরকায় সুতো কাটত। ভেড়াদের ফিরতে দেখে তারা চরকা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উঠে যেত। উঠে গিয়ে ভেড়ার বাচ্চাদের বন্ধ ঘর খুলে দিত আর উনানে ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালাত। ততক্ষণে আঁধার ঘনিয়ে আসত। সকলের বাড়ি দেশলাই থাকত না। বউরা নিজেদের প্রদীপ নিয়ে অন্য বাড়ি গিয়ে প্রদীপ ধরিয়ে আনত। তারপর উনুন ধরিয়ে গরম রুটি তৈরী করত।

জঙ্গল থেকে ফিরে মেষপালকদের গুণে গুণে ভেড়া মেলাতে প্রায় একঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মত সময় লেগে যেত। ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা ভেড়ার বাচ্চারা আর জঙ্গল থেকে চরে ফেরা ভেড়ার পাল মিলে সে এক মহা শোরগোল বাধিয়ে তুলত। মা বাচ্চাদের খুঁজত আর বাচ্চারা ব্যা-ব্যা করে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিত।

ক্ষুধার্ত বাচ্চারা যে-কোন ভেড়ার কোলে ঢুঁ মারত। মায়েরা যেই বুঝতে পারত এই স্পর্শ একেবারে নতুন তারা তখনই লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করত। এই লাফালাফির চোটে ছোট বাচ্চারা পড়ে যেত। মায়েরা তখন যে যার নিজের বাচ্চার জন্য পাগল! তারা এমন লাফালাফি সুরু করে দিত যে বাচ্চাদের চোখে মুখে

তাদের লাথি এসে পড়ত। সারা গাঁ জুড়েই এই হট্টগোল সুরু হয়ে যেত। হাজার বারো-শ ভেড়া আর তাদের চার-পাঁচ-শ বাচ্চাদের গোলমাল। মেষপালক ও তার বউদের তখন যে-কোন সাধারণ কথাবার্তাই জোরে জোরে বলতে হত। ভেড়াদের চিৎকারে তাও ওদের কথাবার্তা চাপা পড়ে যেত। ভেড়ার নাদী ও প্রস্রাবের দুর্গন্ধে চারদিক ভরে যেত।

ভেড়াদের এই চিৎকার ও হৈ-হট্টগোলের মধ্যে মেষপালকদের ভেড়া মেলাতে হত। এটা গঙ্গার বাচ্চা, এই বাচ্চাটা কালো ভেড়াটার, এই রকমভাবে ভেড়া মেলানো চলত। হারিয়ে যাওয়া কোন বাচ্চার ঠ্যাং ধরে তার মায়ের কাছে দিয়ে আসত আর মায়ের পালানে তার মুখটা গুঁজে দিত। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে রোজই এমনধারা কাজ লেগে থাকত। তারপর শোরগোল থেমে যেত। শুধু শোনা যেত দুধ খাওয়ার চুক চুক শব্দ।

বাচ্চাদের ধুলো-ভরা গা মায়েরা চেটে চেটে পরিষ্কার করে ফেলত আর দুধের শাদা ফেনায় বাচ্চাদের মুখ ভরে উঠত।

ঢিবির কাছে দাঁড়িয়ে হয়ত এক মেষপালক এসে জিজ্ঞাসা করে, "কী, ভেড়া মিলেছে?"

"হ্যাঁ, তোর?"

"মিলেছে।"

এর মধ্যে বউদের রুটি তৈরি শেষ হয়ে গেছে। কড়াইর মধ্যে মোটা মুগের ডাল উতলোতে সুরু করেছে। ঘরে গিয়ে সকাল থেকে সঙ্গী হাতের লাঠিটাকে রেখে দেয় এককোণে। হাত মুখ ধুয়ে উবু হয়ে বসে প্রদীপের আবছা আলোয় রুটি খেতে সুরু করে। খাওয়াও নয় আবার ভোজনও নয়। ঠিক কী বলে

অভিহিত করা যায় এমন কোন শব্দ মনে পড়ছে না। ভোজন বললে মনে হয়, তার মধ্যে আরও দু-একটি পদ আছে। কিন্তু মেষপালকরা ব্যঞ্জন কাকে বলে তা জানেই না। ওসব তাদের দরকারই হয় না। ওরা দুবেলা রুটি খেয়েই আহার সারে। আনাজের কচি পাতা, টাক্না হিসাবে একটু চাটনি আর একটু নুন, এটাই ওদের খাবার। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর স্রেফ ওই রুটি খেয়ে ওরা থাকে।

রুটি খাওয়ার পর, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত মেষপালকদের হাত-পা অবশ হয়ে আসে। কম্বল নিয়ে ওরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ টিবির ওপর বসে গল্প-গুজব করার পর ভেড়াদের ডেরায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তাদের বিশ্বাসী কুকুরেরা গুটি-সুটি মেরে পায়ের কাছে বসে থাকে। গোয়ালে থাকে ভেড়ারা। স্ত্রীরা ঘরে গিয়ে নিজেদের বাচ্চাদের সঙ্গে শুয়ে থাকে। ভেড়াদের গোয়ালের দরজার কাছে শিয়রে কুড়ুল রেখে মেষপালকেরা গিয়ে শুয়ে পড়ে। সবাই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু মেষপালক আর তার কুকুরেরা সজাগ থাকে। খুব ভোরবেলাই ভেড়ারা জেগে পড়ত। জেগে উঠে প্রস্রাব করত, নাদী ছড়াত। খুব সকালেই উঠে পড়ত ওরা। গোয়ালে গোয়ালে ভেড়াদের চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেত। তাদের ছেড়ে দিতেই বাচ্চারা মায়ের পালানে মুখ গুঁজে দিত দুধ খাবার জন্য। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘ্রাণ নিতে নিতে আরামে দাঁড়িয়ে থেকে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াত ভেড়াগুলি। গোয়ালে গোয়ালে নাদীর স্তূপ জমে যেত। প্রস্রাবের পুকুর হয়ে যেত। হাতে ঝাঁটা নিয়ে মেষপালকরা গোয়াল ঝাঁট দিতে লেগে যেত। তারপর দামী

সারগুলি ঝুড়ি ভরে ভরে বাইরে ঢালত। ওই জমানো নাদী দেড় বছর পরে কৃষকেরা এসে কিনে নিয়ে যেত। এইজন্যই ওরা যত্ন নিত ওগুলি জমিয়ে রাখার ব্যাপারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব কাজকর্ম চলত ততক্ষণ দুধ খেয়ে খেয়ে বাচ্চাদের পেট ভরে উঠেছে। ছোট ছোট লেজগুলো নাড়তে নাড়তে লোমভরা ভেড়ার বাচ্চাগুলো লাফ-ঝাঁপ শুরু করে দিত। ওদের সবাইকে এক জায়গায় করে মেষপালকরা একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে দিত। বউদের তৈরি গরম গরম রুটি দিয়ে ওরা সকালের জলখাবার খেয়ে নিত। দুপুরের জন্য দু-চারটি রুটি আর কয়েকটা লঙ্কা তারা সঙ্গে নিয়ে যেত। তারপর কম্বল আর লাঠিগাছি হাতে নিয়ে তারা ভেড়াদের ইশারা করত। জঙ্গলে যাবার জন্য আকুল ভেড়ার দল চটপট উঠে দাঁড়াত। আটক বাচ্চাগুলো তখন তারস্বরে চেঁচাতে লাগত। বার বার তাদের দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে মায়েরা জঙ্গলের দিকে পা বাড়াত।

সকালের মিষ্টি রোদ তেতে ওঠার আগেই ওরা বেরিয়ে পড়ত। দূরের ক্ষেত ডিঙিয়ে ভেড়াদের নিয়ে ওরা চলে যেত। ভেড়াগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাঁ-টা নিঃঝুম হয়ে পড়ত। যে দু-একজন চাষা গ্রামে থাকত তারাও গরু নিয়ে জঙ্গলে চলে যেত। ছোট ছোট বাচ্চারা ছাগল চরাতে চলে যেত। মেয়েরা ছোট বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বা ঝুড়ির ওপর চাপিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে চলে যেত। পোষা কুকুরগুলোও তাদের পিছন পিছন ছুটত। দুপুরবেলা ওয়াড়ীতে চরখায় উল তৈরি করা মেয়েলোকেরা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যেত না।

ছয়

কয়েকদিন হল, দশ-বারোটি বাচ্চা নিয়মিত পাঠশালায় আসতে শুরু করেছে। যাদের কোন রুজিরোজগার করার বয়স হয়নি, ছাগল চরাবার কাজও করতে পারে না, সেইসব বাচ্চা ছেলেরাই পাঠশালায় আসে।

আমি তাদের অ-আ-ক-খ পড়ানো শুরু করে দিলাম। হাত সড়গড় করা জন্য লেখাও শুরু করলাম।

ভোর হতে না হতেই, ভেড়ার বার হবার আগেই হাতমুখ-গা ধুয়ে মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে, জামা গায়ে দিয়ে, কেউ কেউ বা ল্যাংটো হয়েই পাঠশালায় এসে হাজির হত। গোবর-লেপা মাটিতে বসে একে অন্যের সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিত। শুরু হত স্লেটের ওপর পেনসিল দিয়ে লেখা। থুথু দিয়ে স্লেট মোছার ধুম। কেউ-না-কেউ ছুতোয় নাতায় বার বার বাইরে যেত। পাঠশালার পিছনে দেওয়ালের পাথরের ওপর আবার অনেকে পেনসিলের সীস সরু করার জন্য ঘষত। বার বার ঘষার ফলে কতগুলি জায়গায় পাথরের এমন অবস্থা হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল বুঝি কোন সাধু গায়ে ছাই আর ধুলো মেখে বসে আছে। পেনসিলের শিষ এভাবে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে গেলে বাচ্চাদের বাপ-মা এসে আমার কাছে নালিশ করত। বার বার বলেছি, পাঠশালায়

আসার সময় মুখ ধুয়ে স্লেট মোছার জল ন্যাকড়া নিয়ে আসবে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। মুখ ধোবার জন্য কোন বাচ্চাকে বাড়ি পাঠালে সে আর ফিরে আসত না। ভিজে ন্যাকড়াও দু-এক ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যেত। তাই তারা সেই আগের পদ্ধতিই বেছে নিত— অর্থাৎ থুথু দিয়েই স্লেট মোছার কাজ সারত।

পাঠশালার ভিতরে ছোট ছোট মশার কামড়ে কোন-না-কোন বাচ্চার চোখ লাল হয়ে উঠত। কারও বা চোখ উঠে যেত। তার ছোঁয়ায় অন্যদেরও সেই অবস্থা হত। চোখের ব্যথায় বাচ্চা কাঁদত, ছটফট করত, তাদের মায়েরা আবার চোখ ওঠা সারাবার জন্য দুধের মধ্যে তুলো ভিজিয়ে শোবার সময় চোখ পরিষ্কার করে দিত। চোখ ভাল হবার জন্য মা মাওলীর কাছে মানত করত।

খুব ভোরে পাঠশালা বসায় বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই পাঠশালা ছুটি হয়ে যেত। হৈ হল্লা করতে করতে দৌড়তে দৌড়তে বাচ্চারা বাড়ি ফিরত। ফের তিনটের সময় পাঠশালা বসত। ছটায় ছুটি হত।

তারপর পাঠশালার সামনে 'লোন পাট' খেলার জন্য ভিড় শুরু হয়ে যেত। জ্যোৎস্না রাতে এ খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলত। জঙ্গল থেকে ফিরে যোয়ান ছেলেরাও ওই খেলায় যোগ দিত। কখনও বা তারা আমাকেও দলে টানত। চালের পিঠের মত ধবধবে সাদা জ্যোৎস্নায় 'লোনপাট' খেলা দারুণ জমে উঠত। আর হনুমানজীর মন্দিরের ঢিবির ওপর, নিমগাছের ঢিবির ওপর বসে বড় মানুষেরা 'এই. খেলা দেখত।

সামনের মাঠে পাথরের ছোট বড় গোল চাঁই পড়ে থাকত।

উঠতি বয়সের ছেলেরা এইসব পাথরের ওপর শক্তি পরীক্ষা করত। ওই ভারী পাথরের চাঁই কে মাথায় তুলতে পারে তারজন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। ছেলেরা করত কি, মাথার পাগড়িটা খুলে সেই চাঁইয়ের মাথায় পরিয়ে দিত। দেখে মনে হত ঠিক অবিকল মানুষ। তারপর তাকে মাথায় তুলে মাটিতে ফেলে দিত। মাটি কেঁপে উঠত। বড় বড় গোল পাথরগুলিকে ত্নহাত দিয়ে ধরে বুক পর্যন্ত তুলে আবার মাটিতে ফেলে দিত।

গাঁ থেকে ত্নু-তিন ফার্লং দূরের এক গ্রাম থেকে বিরা নামে এক মেষপালকের ছেলে সতা রোজ পাঠশালায় আসত। আগের মাস্টারমশাই গোটা চারেক অক্ষর ঠিকমত শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে যে ত্নু-চারজন ছাত্র পড়াশোনায় একটু এগিয়ে ছিল, তার মধ্যে সতা একজন। বারো-তেরো বছরের ছেলেটি এরমধ্যেই খুব লম্বা-চওড়া হয়ে উঠেছিল। অন্য ছেলেরা যা বুঝতে পারে না, সতা তাই বুঝত। তার শেখারও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। পাঠশালা ছুটি হয়ে গেলেও সতা ঢিবির ওপর বসে বসে পড়া মুখস্থ করত। নয়ত কখনও কখনও আমার ঘরে এসে অঙ্ক জিজ্ঞাসা করত। ওর এত লেখাপড়ার ঝোঁক দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “পাঠশালায় কতদূর পড়ার ইচ্ছা আছে সতা ?”

সতা জবাব দিল, “ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পাস করব।”

“তাহলে তো মহকুমায় যেতে হবে।”

“যাব।”

“বাবা পড়ার কথা বলেছে ?”

“তার কথা কে শোনে ?”

লেখাপড়া শিখলে বাচ্চারা আর চাষবাসে মন দেবে না। ফর্সা

কাপড় পরে বেড়িয়ে বেড়াবার শখ হবে এইসব মনে করে বিরা ছেলেকে বেশীদূর পড়াবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তা সত্ত্বেও আমি সতার দিকে বিশেষ নজর দিতে লাগলাম। এই পাঠশালা থেকে যদি দু-একজন মেধাবী ছাত্র বাইরে পড়তে যায় তাহলে তা আমার পক্ষে গৌরব। সতাই এর মধ্যে বাইরে যাবার উপযুক্ত। স্বাভাবিক কারণেই সে আমার মনের মত ছাত্র হয়ে গেল।

এই দশ-বারোটা ছেলে ছাড়া রোজ পাঠশালায় এসে হাজিরা দিত আরও তিনটি ছেলে— আয়বু কসাই, আনংদা রামোশী আর রামা গড়রিয়া।

এই তিনজন কিছুক্ষণের জন্য হলেও রোজ পাঠশালায় আসত আর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকত। না কিছু বলত, না কিছু করত, কিন্তু আসত রোজই। তারা হয় বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নাহয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। ওদের জন্য আমার কোন অসুবিধাই হত না। কিন্তু এরা কেন যে রোজ এসে এভাবে বসে থাকত তা জানার কৌতূহল আমার অবশ্যই ছিল। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, সময় কাটানোই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

নোংরা শরীর আর ময়লা জামাকাপড় পরা আয়বু তো বেকারই ছিল। ওর অবশ্য কোন কাজ করার দরকার হত না। কারণ লোকে কাজ করে পেটের জন্য, কিন্তু আয়বুর সে সমস্যা ছিল না। কারণ আয়বু জাতে কসাই বলে গাঁয়ের লোক ওকে খাতির করেই গ্রামে রেখে দিয়েছিল। কারণ দরকারের সময় পাঁঠা কাটার জন্য গাঁয়ের লোকদের অনেক দূর থেকে কসাই নিয়ে

আসতে হত। এতে বেশ দেরী হয়ে যেত। আয়বুকে পেয়ে গাঁয়ের লোকদের বেশ সুবিধা হয়ে গেল। আয়ুবেরও রুজি-রোজগারের সংস্থান হয়ে গেল। দুপুর হলেই আয়বু বাড়ি বাড়ি গিয়ে রুটি আর ডাল জোগাড় করে নিয়ে আসত। কোথাও বসে খেয়ে নিত আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলত। ওর কোন কষ্টই ছিল না। এর থেকে বেশী খাবার ওর দরকারই ছিল না। আর গাঁয়ের লোকদেরও দু-চারখানা রুটি দিলে কিছু এসে যেত না। ওর শোওয়ারও কোন কষ্ট ছিল না। মাঠ আছে, ঢিবি আছে, আমার ঘর পড়ে আছে। বিছানা পাতারও ওর কোন দরকার নেই। বেওয়ারিশ কুকুর বা রাস্তার জানোয়াররা যেভাবে শোয় ও সেরকম যে-কোন জায়গাতেই শুয়ে পড়তে পারত। ওর শরীর এমন কড়া হয়ে গেছে যে ঠাণ্ডা জলেও তা নরম হবার নয়।

পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের আনংদা রামোশীও বেকার। লম্বা শুকনো পাকানো শরীর। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল। মাথায় গান্ধী টুপি। গায়ে একটি কোট আর নীচে পরা ছোট্ট এক হাফ প্যাণ্ট। ওয়াড়ী গ্রামে যে দু-চার ঘর রামোশী ছিল তার মধ্যে আনংদা রামোশী একজন। এইসব রামোশীরা কেউ কোন ব্যবসাপত্তর করত না। তবু তাদের পেট ঠিক চলে যেত। খাওয়ার একটু কষ্ট হলেই আনংদা কাঁধে একটা কম্বল নিয়ে তিন প্রহরের সময় বাইরে চলে যেত। ঐ গ্রামের আশেপাশে তিন-চার মাইল দূরে অন্য গ্রামের ক্ষেত ছিল। ঐ ক্ষেতের মালিক জিজ্ঞাসা করত, 'আনংদা কোথায় যাচ্ছ?'

সে জবাব দিত, 'এই একটু রামা লিংগাড়ের ক্ষেতে যাচ্ছি।' আবার যদি রামা লিংগাড়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কীরে বদমাশ, কী

ব্যাপার ?' তবে আনংদা হাতজোড় করে বলত, 'রাম রাম, একটু তুকা কারংডের বাগানের দিকে যাচ্ছি।'

তুকা কারংডে জিজ্ঞাসা করত, 'কি হে আনংদা, কী মতলব ?'

আনংদা হাত কচলে বলত, 'একটু ভোঁসলের জমির দিকে যাচ্ছি।'

এরকমভাবে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে খোঁজ করত কোথায় পেঁয়াজ পাওয়া যায়, কোন বাগানে বেগুন, কোথায় জোয়ার, কোথায় বা বাজরা পাওয়া যায়। আর যখন রাত্তির হয়ে যেত তখন সকলের খোঁজখবর সেরে আনংদা এ জঙ্গল থেকে ছুটো ভুট্টা, কোথা থেকে এক মুঠো লঙ্কা, ওখান থেকে কিছু বেগুন নিয়ে কম্বল ভরতি করে গ্রামে ফিরে আসত। সকাল হলেই ভুট্টাগুলি ছাড়িয়ে তার দানা বার করে ফেলত আর আনংদার বউ সে দানা পিষে রুটি তৈরি করত। বেগুনের তরকারি বানাতো। এত বড় ক্ষেত থেকে চার মুঠো ভুট্টার দানা চুরি গেলে ক্ষেতের মালিক ধরতেই পারত না। পাখিরা খেয়ে গেছে না জানোয়াররা নষ্ট করেছে তার কোন হদিশ পাওয়া যেত না। আনংদাকে কেউ সন্দেহই করত না। বছরের পর বছর তার ছিল এই ব্যবসা। ঐ লোকটি এরকম ছোট ছোট চুরিকেই রুজি-রোজগারের পথ করে নিয়েছে আর সেইমত সব-কিছু ব্যবস্থাও করে নিয়েছে। তার এই ব্যবসা বেশ ভালই চলছিল।

কতবার দশ-বারো দিন পরেই মালিকদের কাছে গিয়ে সে তার ছোটখাটো চুরির কথা কবুল করেছে। নিজেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করত, "আচ্ছা প্যাটেল মশাই, আপনার বাগান থেকে দশ-পনেরো দিন আগে কেউ কি বেগুন ছিড়ে নিয়ে গেছে ?"

"হ্যারে আনংদা, কোন চোর এসেছিল কে জানে? থলি ভরতি করে বেগুন নিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা? দেখুন, ওই বেগুন আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"বদমায়েস! সে কথা আবার নিজের মুখেই বলছিস, বেহায়া কোথাকার!"

"স্বীকার করে নিলে চুরির অপরাধ মাপ হয়ে যায় হুঁজুর। এমনিতে চাইলে কেউ দেয় না, তবে কি করব বলুন? এই যে এত পোকামাকড়, পাখি, পায়রা রোজ কত আনাজ খেয়ে ফেলছে, তা তাদের কি কেউ আগে থেকে অনুমতি নেয়? যেমন আপনি তাদের কিছু বলেন না, তেমনি আমাকেও কিছু বলবেন না। মনে করবেন পাখিরাই খেয়ে গেছে। আর সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে যান।"

আনংদার এমনধারা স্বভাবের কথা সকলেই জানত। কখনও সে সময় পেলে দু-একজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে জঙ্গলে চলে যেত। সেখান থেকে খরগোশ ধরে এনে খেত। যখন খরগোশে অরুচি ধরে যেত তখন আবার দূরের কোন গ্রাম থেকে ভেড়া চুরি করে নিয়ে আসত। তারপর কাটাকুটি, রান্না সেসব জঙ্গলের ভেতর বসে বসে করত। এইভাবেই বেঁচে ছিল আনংদা। মাঝেমাঝে চুরি করা ছেড়ে দিলেও আসলে তার কাজই ছিল এই।

রামা গড়রিয়া (মেষপালক) ছা-পোষা লোক। বয়স হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বেঁটের ওপর লম্বা ঘন পাকানো গোঁফের জন্য তাকে যণ্ডা-গণ্ডা বলে মনে হত। ওর শ-খানেক ভেড়া ছিল। তাদের দেখাশোনা ওর বাবা আর ছেলে মিলেই করত। রামার কোন কাজ ছিলনা। কাজ নেই না ব'লে কাজ করে না বলাই ভাল। ও

তাই পাঠশালায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। অনেকদিন পাঠশালায় এমনি চুপচাপ বসে কাটিয়েছে। পাঠশালার ছুটির পর গায়ে কম্বল জড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে যেত। প্রথম প্রথম আমি ওকে জিজ্ঞাসা করতাম, কী, কোন দরকার আছে? এখানে এসেছ কেন? উত্তরে ও খুব আস্তে আস্তে বলত, 'কিছু না, এমনি এসেছি।'

এরকম ভাবে অনেক দিন বসে থাকার পর সে একদিন বলল, "মাস্টার, তোমাকে দিয়ে আমার একটা কাজ আছে।"

পাঠশালার ছুটি হয়ে গিয়েছিল। আনংদা, আয়বু এরা সব চলে গিয়েছিল। পাঠশালায় খালি আমি আর রামা ছিলাম। যে কখনও একটাও কথা বলে না, তার মুখে কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমাকে দিয়ে এর কী কাজ হতে পারে তা অনুমান করতে পারলাম না। বললাম—

"কী ব্যাপার বল তো?"

রামা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। মাথা নীচু করে কিছুটা সময় নিল। বলবে কি বলবে না, তখন তার মনে দ্বন্দ্ব চলছে।

ওর সঙ্কোচ দূর করার জন্য বললাম, "কী ব্যাপার রামাজী, কোন কথা আছে?"

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে রামা জবাব দিল, 'আমার কাছে একটা 'জুড়েওয়ালা' টাকা রয়েছে।"

জুড়েওয়ালা টাকা মানে রাণী ভিক্টোরিয়ার ছাপ মারা। ছবিটা এমন যে দেখে মনে হয় রাণী খোপা বাঁধছেন। সরকার ওই টাকার প্রচলন এখন বন্ধ করে দিয়েছেন।

"'তাতে কী হয়েছে?"

"আমি বলছিলাম কি, ওই টাকা তো এখন আর চলে না। তাই আমার মত গরীব লোকদের বড় ক্ষতি হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, তা চলে না। বাজারে এখন আর ও টাকা কেউ নেবে না।"

"তা আপনি তো মহকুমা শহরে প্রায়ই যাওয়া-আসা করেন। একটু দেখবেন যদি টাকাটা চালানো যায়, তাহলে বড় উপকার করবেন।"

চলবে কিনা, তা আমি জানতাম না। আমার কখনও এই টাকা চালাবার দরকার হয় নি। তা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। এই মনে করে আমি বললাম, "দেখতে পারি যদি চলে,— তা টাকাটা আমাকে দিয়ো।"

রামা বেশ বিগলিত হয়ে চলে গেল। রাত্রিবেলা আমার ঘরে এসে টাকাটা দিয়ে গেল। এমন করে দিল যেন কোন হীরা জহরৎ দিচ্ছে। টাকাটা দেওয়ার সময় তার যে বুক ধড়ফড় করছিল তা আমি টের পেলাম। মাস্টার যদি টাকাটা মেরে দেয় তাহলে ?

সাত

শনিবার দুপুরে পাঠশালা ছুটির পর আমি বিভূতিওয়াড়ী গেলাম। দেড় দিন বাড়ি কাটিয়ে পাঠশালায় ফিরলাম। রামার টাকার কথাটা মনে ছিল। ভাঙিয়ে এনেছি। কিন্তু দু-চারদিন ধরে সে পাঠশালায় আসছিল না। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম

ওর একটা ভেড়া হারিয়ে গেছে। তাই সেই হারানো ভেড়ার খোঁজে সে অন্য গ্রামে গেছে।

পরে সে একদিন পাঠশালায় এলে, পকেট থেকে রেজগি পয়সা বার করে তাকে দিয়ে দিলাম।

"তোমার টাকাটা ভাঙানো গেছে। এই নাও রেজগি।"

আমি পড়ানো শুরু করে দিলাম। খুচরো পয়সা ধুতির গিঁঠে বেঁধে রামা যে কখন বাড়ি চলে গিয়েছে আমি টেরও পাই নি।

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা বই নিয়ে পড়ছিলাম। এর মধ্যে রামা কখন ফিরে এসেছে। কখনও ও আমার ঘরে আসে না। আজ ঘরের ভেতর এসে মেঝের ওপর বসে পড়ল। আমি বললাম, "কী রামাজী ভেড়া পেলে?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি। পাশের গ্রামেই পেয়েছি।"

"তা পেতে চারদিন লেগে গেল কী করে?"

"মেটবারওয়াড়ীতে আমার বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

আমি আবার পড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ বসার পর একটু গলা খাঁকরি দিয়ে রামা বলল, "মাস্টার, আমার টাকাটা ভাঙালে কী করে?"

"এনেছি এক চেনাশোনা বেনিয়ার কাছ থেকে।"

"না-না, সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না। কীভাবে পয়সাটা এনেছ— গাঁটে বেঁধে না পায়জামার পকেটে করে?"

এ প্রশ্নের রহস্যটা ঠিক উদ্ধার করতে পারলাম না। বললাম, "পায়জামার পকেটে করে এনেছি।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"তাহলে মনে করে দেখ তোমার পকেটে আগে থেকে কিছু পয়সা ছিল কি না।"

উত্তর দিতে আমার কিছু সময় লাগল। "ছিল, কিন্তু কেন?"

"ব্যস হিসাব মেলে গেছে। আমার কাছে বেশী পয়সা চলে গিয়েছিল।" এই বলে সে পকেট থেকে কাপড়ের একটা থলি বার করে তা থেকে দু-আনা বার করে আমার সামনে রাখল।

এই দু-আনা পয়সা দেখে আমার সব মনে পড়ে গেল। ভিক্টোরিয়ার ছবি আঁকা টাকা অচল হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ওর মধ্যে রুপো থাকার ফলে কোন কোন ব্যবসাসী আঠারো আনা দিয়ে টাকাটা কিনে নিত। ঐ হিসাবে রামার টাকায় আঠারো আনা পাওয়া গেছে। পয়সা ফেরৎ দেবার সময় সে কথাটা বলতে একেবারে ভুলে গেছি। রামা বাড়ি গিয়ে চার আনা চার আনা করে যতবার হিসাব করেছে প্রতিবারেই দু-আনা বেশী হচ্ছে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই ও ভেবেছে মাস্টার ভুল করে দু-আনা বেশী দিয়েছে আর এই ভেবেই ও জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

ওর কাছে আসল ঘটনা সব বলে দু-আনা পয়সা ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। তখন ও এক আনা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই এক আনা রেখে দাও। পান-তামাক খেয়ো।"

আমি ও পয়সা নিলাম না। রামাজী অনেক করে বলল, কিন্তু আমি তাও নিই নি। রামা বলল, "তাহলে ওই টাকা এখনও চলে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ চলে। শুধু চলে যে তাই শুধু নয়— টাকায় দু-আনা করে লাভও হয়।"

"তা আমি জানব কী করে। গাঁয়ের অনেকের কাছেই এইসব

টাকা পড়ে আছে। অন্তত দশ-বারো জনের কাছে তো আছেই। টাকাগুলো ভাঙিয়ে এনে দেবে?”

“গ্রামের লোকের ব্যাপার গ্রামের লোক্‌ দেখবে। আপনার কাছে থাকে যদি দেবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।”

পরের সপ্তাহে রামা আমাকে বারোটা টাকা ভাঙাতে দিল। আমি আঠারো আনা হিসাবে টাকাগুলি ভাঙিয়ে এনে রামাকে দিয়ে দিলাম। পান-তামাকের জন্য রামা আমাকে চার আনা পয়সা রেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। আমি নিই নি।

ওইদিন রাত্রিবেলা রামা আমাকে তার বাড়িতে আসতে বলল। ওর সেই অন্ধকার ঘরে সাবধানে মাথা নীচু করে আমি ঢুকলাম। উনানের ধারে বসে ষাট-সত্তর বছর বয়সের এক বুড়ো হুঁকো টানছিল। রামার বউ ঘরের কাজ করছিল।

রামা আমার বসার জন্য একটা কম্বল পেতে দিল। একটি গেলাসে করে ছাগলের দুধ এনে দিল। গরম দুধ ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষা করেছিলাম। উনুনের সামনে বসা বুড়োকে দেখিয়ে রামা বলল, “ইনি আমার বাবা।” বৃদ্ধের গায়ে শুধু একটি কাপড় জড়ানো। অপ্রস্তুত হয়ে সে অবস্থায় সে হাত বার করে আমাকে ‘জয়রামজী’ বলে অভ্যর্থনা জানাল।

রামা বলল, সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে। আট বছর বয়স থেকে সে এ কাজে নেমেছে। অন্য কিছুই সে জানে না।

আট বছর বয়স থেকে শুরু করে সে আজ পর্যন্ত ভেড়া পালন ছাড়া আর জীবনে কিছু করে নি। আর আজও সে তাই করছে। নাতির সঙ্গে সে এখনও দিনরাত ভেড়ার পিছন পিছন ঘোরে। এখন তার মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মাথার সব চুল পেকে

গেছে। তবুও এই বুড়ো হাতে লাঠি নিয়ে এখনও ভেড়া চরাতে যায়। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ সে জানে না। এমনকি কী করে গরুর গাড়িতে গরু জোতে তাও সে জানে না। কিন্তু কুকুররা যেমন শিয়ালের গন্ধ বুঝতে পারে এরকম এ বুড়োও পারে। সার দেবার জন্য রাত্তির বেলা যখন ভেড়াদের সারারাত ক্ষেতের মধ্যে রেখে দেওয়া হত তখন বুড়ো গন্ধ শোঁকবার মত করে নাক টেনে বলত, এই ছোকরারা, হুঁশিয়ার থেকো। আশেপাশে শেয়াল ঘুর ঘুর করছে।

ছোকরারা সাবধান হয়ে যেত। কুকুরেরা এদিক ওদিক কড়া নজর রাখত। তখনই দূরে টিলার ওপরে শিকারী শেয়ালদের উপস্থিতি ধরা পড়ে যেত। ভেড়া ধরার মতলবে সন্তর্পণে বসে থাকা তার এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে শরীর টান টান করে শোওয়াই সে এখন ভুলে গেছে। ঘোড়া, গরুরা যেমন বসে বসে ঘুমোয়, এই বুড়োও তেমনি বসে বসেই ঘুমিয়ে নেয়। মাটিতে শুয়ে শুয়ে ঘুমনোর তার দরকারই পড়ে না। একদলের ভেড়া আর-এক দলে মিশে গেলে তাদের কী করে চিনে নেওয়া হয় সেটি এখনও আমার কাছে রহস্য। কিন্তু বুড়ো কাকুয়া ঠিক ভেড়াদের চিনে নিতে পারে। যারা নতুন করে ভেড়ার ব্যবসা শুরু করে তারা কিন্তু ভেড়া কিনেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে না। এ রকম ব্যবসা শুরু করা লোকেরা আধখানা নারিকেলের মধ্যে মাঙ্গলিক কাঁচা হলুদ দিয়ে সেটি নিয়ে কোন কৃতি মেষপালকের কাছে গিয়ে তাকে সেগুলি দিয়ে বলে, “আমি শুভ কাজ শুরু করছি” তখন ওই মেষপালক নিজের ঝাঁকের থেকে একটি ভেড়া বার করে তাকে বিনা পয়সায় দিয়ে দেয়। এইভাবে দশ-

বারো'টি ভেড়া জোগাড় করে ব্যবসা শুরু হয়। আর দু-তিন বছরের মধ্যে তারা আবার অন্য ব্যবসায়ীকে তাদের ভেড়ার বাচ্চা দিতে পারে। কিন্তু বাচ্চা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেসব ভেড়া এইভাবে চেয়ে আনা হত তাদের বিক্রি করা যেত না। কাটাও যেত না। এই নিয়ম সকলেই মেনে চলত।

ভিন গাঁয়ের কে একজন একবার বুড়ো কাকুয়ার কাছ থেকে দু-চারটে ভেড়া নিয়ে গিয়েছিল। দু-একবছর পরে বুড়ো কাকুয়া ঐ গ্রামে গেল। সেই লোকটা বুড়োকে তখন বলল, "কাকুয়া তোমার ভেড়া মরে গেছে।"

"মরে গেছে? ওর কোন বাচ্চাও নেই?"

"না। বাচ্চাটাচ্চা কিচ্ছু নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।"

বুড়োর এসব কথা সত্যি বলে মনে হল না। সে বলল, "তোমার ভেড়ার ডেরা দেখাও।"

লোকটা দেখাল। অনেকক্ষণ বুড়ো ভেড়া দেখতে লাগল আর কিছুক্ষণ বাদে বুড়ো তার ভেড়ার বাচ্চাদের খুঁজে বার করল।

বুড়ো বলল, "এই দুটো বাচ্চা আমার ভেড়ার।"

বুড়োর অনুমানই সত্যি। বুড়ো শেষ পর্যন্ত তা স্বীকার করে নিয়েছিল। রামা তার নিজের বাপ সম্পর্কেই এই গল্পটি বলেছিল। শুনে আমার খুব অবাক লাগল। আমি কাকুয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকুয়া, আপনি তাদের চিনলেন কী করে?"

বুড়ো বলল, "তার কারণ আছে, খোকা। চেহারা, রূপ, গায়ের রং লুকোবে কোথায়? এই যে তুই— তোর বাবার, মার, তোর দাদুর কিছু-না-কিছু আদল তোর চেহারার মধ্যে আছে। নাক, বা চোখ কিছু-না-কিছু একরকম হবেই।"

তারপর রামা আমাকে আরও ভেতরে নিয়ে গেল, প্রদীপের আলোতে রামা আরও ভেতরে গিয়ে একটা ছোট মাটির হাঁড়ি নিয়ে এল। তার মধ্যে ছিল রুপোর টাকা। রাণীর ছাপ মারা টাকা। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। মেষপালকের যে এত টাকা থাকতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতেও পারিনি।

রামা বলল, "অনেকদিন ধরে জমিয়ে রেখেছি। এগুলো গুণে ভাঙিয়ে নিয়ে এসো।"

আমি সব টাকা গুণলাম। তিনশ চল্লিশ টাকা হল। রামাকে বলতেই সে মেনে নিল আর পরম নিশ্চিন্তে টাকাগুলো আমার কাছে জমা করে দিল। রামা একবারও ভাবল না যে মাস্টার পাঁচ টাকা কম করে গুণতে পারে। মাস্টার যে এই টাকা থেকে কিছু মেরে দিতে পারে তা সে একবারও ভাবল না। আমি বললাম, "রামাজী, এত টাকা একসঙ্গে ভাঙাতে একটু দেরী হবে। আপনার তাড়াতাড়ি দরকার নেই তো?"

রামা বলল, "না, না, তুমি তোমার সুবিধেমত ভাঙিও। দশ-পনেরো দিন দেরী হলে কিছু এসে যাবে না।"

আমি উঠে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

আট

মে মাস শেষ হয়ে জুন মাস এসে গেল। গ্রীষ্ম কেটে গেছে। বর্ষা শুরু হয়েছে। বাদলা পোকাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মৃগ ঋতুর বর্ষা শুরু হয়ে গেল। আকাশ কালো হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রোদ আর নেই। হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গাছপালা দুলছে হাওয়ায়। চারিদিকে ধুলোমাটি উড়তে শুরু করেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে লোকে বলছে, হাওয়া দেখছি মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। মৃগনক্ষত্রের বর্ষা বনগরওয়াড়ীর ওপর নামল অঝোর ধারায়। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ বৃষ্টি যে তাড়াতাড়ি থামবে তা মনে হচ্ছে না। মেষপালকদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। টোকা মাথায় দিয়ে তারা ঘরমুখো ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে গোয়ালে নিয়ে যাচ্ছে, ঝোপড়ীর মধ্যে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে ভেড়ার দল গা ঝাড়তে শুরু করেছে। ভেজা লোমের গন্ধে মেষপালকদের ঘর ভরে গেছে। বৃষ্টির ওপর আরও ঝেঁপে বৃষ্টি এল। গরম মাটির ভেতর থেকে সাপেরা বেরিয়ে পড়েছে। ধুলো উড়ল; কাদা হয়ে গেল সব মাটি। তাও পরে জলের তোড়ে ধুয়ে মুছে গেল। ঘাস, লতাপাতা দিয়ে

ছাওয়া ছাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়তে লাগল। সুন্দর করে লেপা পোঁছা ঘরের মেঝেগুলি গলে যেতে লাগল। তখন মেষপালকদের বউরা টপটপ করে জল পড়ার জায়গায় বাসন বসিয়ে রাখল। ভেড়াদের চেঁচামেচি আর বাসনের মধ্যে বৃষ্টির জলপড়ার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যেতে লাগল। মেষপালকরা তখন টোকা মাথায় দিয়ে ঘরের চালে উঠে ফুটো জায়গাটায় মাটি ও পাথর চাপা দিয়ে তখনকার মত জল পড়া বন্ধ করে দিল।

শিরশির হাওয়া বইছে। ক্রমাগত বৃষ্টির জল লেগে মেষপালকদের কুঠারে মরচে পড়তে শুরু করেছে। মেষপালকদের বউরা বাড়ির ভেতর লবণ জমিয়ে রেখেছিল, সেগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গলে গেল। টিয়াপাখির মত সবুজ রঙের কচি ঘাস মাটি থেকে মাথা বার করছে। উঠানে, ছাদে, দেওয়ালে, যেখানে ঘাস হবার কথা নয়, সেখানেও কচি কচি ঘাস জন্মে গেছে। সর্বত্র শুধু সবুজের সমারোহ চোখে পড়ে।

আঙুলের নখের ওপর বসতে পারে এমন ছোট ছোট ব্যাঙের বাচ্চা চোখে পড়ছে। রাস্তার ওপর তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে কাকেরা তাদের ওপর ছোঁ মারছে। ছোট ছোট পাখাওয়ালা পতঙ্গ উড়তে শুরু করা মাত্র শালিক, চড়ুই পাখিরা তাদের খেয়ে সাফ করছে। যারা তাদের হাত থেকে বেঁচে গেল, তারা সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোতে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে লাগল। দুদিন বাদে তাদের পাতলা পাতলা পাখনাগুলি এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

ইঁটের মত রঙের লম্বা লম্বা কেন্নোগুলো একটার ওপর আর-একটা উঠে অনেকগুলো পায়ে ভর করে চলতে শুরু করেছে।

আগুলের মত এই কেন্নোগুলো দুলকি চালে চলতে লাগল। মানুষ বা জানোয়ারের ছোঁওয়া পেলে এরা মাটিতে গোল হয়ে লেপটে যেত। মেষপালকের বাচ্চারা জেনেশুনেই সেইসব পয়সার মত গোল কেন্নোপোকাগুলোকে হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে দিত।

মাছির উপদ্রব খুব বেড়ে গেল। ঝোপড়ীর মধ্যে মাছিদের ভনভনানি শুরু হয়ে গেল। ভেড়াদের নাকে মুখে মাছি বসতে লাগল। মশাও খুব হয়েছে। তারা মেষপালকদের চোখের সামনে উড়তে শুরু করে দিয়েছে।

বৃষ্টি থেমে গেল। বর্ষায় হাল দেওয়া জমির মাটি গলে একাকার হয়ে গেছে। জমিগুলো যেন বৃষ্টির সব জল নিঃশেষে পান করে নিয়েছে। এখানে ওখানে ছোট-বড় পুকুর হয়ে গেছে। তার জলে নীল-কালো আকাশের ছায়া। ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে যেমন লোকদের তেমনি ভেড়া ও অন্যান্য জানোয়ারদেরও পা কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে।

মালভূমি ভিজে একাকার হয়ে গেছে; মালভূমির ওপর কচি কচি সবুজ ঘাসগুলিকে গাঢ় কালো রঙের ভেড়াগুলি ঘুরে ঘুরে খেতে শুরু করেছে। আর ওদের পিঠের ওপর বসে কালো কোতোয়াল পাখিরা ফটফট আওয়াজ শুরু করে দিয়েছে। আর আড়ালে বসে বসে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করেছে তিতির পাখির দল।

নয়

বনগরওয়াড়ীর এই পাঠশালা নির্দিষ্ট সময়ে খোলা বা বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। সমস্ত জায়গায় যখন গ্রীষ্মের ছুটি তখন এ গ্রামে ফসল কাটার সময়। যখন ইচ্ছে হত তখন ছেলেরা পাঠশালায় আসত। যেমন বাস পুরো ভর্তি হয়ে গেলে তবে ছাড়া হয়, তেমনি পাঠশালা পুরো ভরতি হলে মাস্টারমশায় পড়ানো শুরু করত। এই কারণেই মাস্টারের কাজ-কর্ম পাঠশালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। কেউ এসে চিঠি লিখিয়ে নিত, কেউ দরখাস্ত লিখতে দিত। রবিবার করে ছুটিতে যখন বাড়ি যেতাম তখন সবাই ডাকে ফেলে দেবার জন্য এত চিঠি দিত যে আমার কোটের দু পকেট ভরতি হয়ে যেত। এসব কাজ করে কোন পয়সা নিতাম না বলেই লোকে এত আমার কাছে কাজের জন্য আসত। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া থেকে শুরু করে ভেড়াচুরির সালিশী পর্যন্ত তাবৎ নালিশ আমার কাছে আসত। মাস্টারমশাই শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বহু কায়দা-কানুন জানেন। ভালমন্দ যাই হোক সবকিছু বোঝাবার মত ক্ষমতা তাঁর আছে এই ছিল ওখানকার লোকদের বিশ্বাস।

সুতরাং পাঠশালার কাজের চেয়ে এই সব আজেবাজে কাজেই আমার সময় কাটতে লাগল। এদিকে শিক্ষা বিভাগ থেকে অভিযোগ আসতে লাগল, পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা এত কম হচ্ছে

কেন। 'পাঠশালা নতুন', 'গাঁয়ের পাঠশালা' এই সব নানান কারণ দেখিয়ে আমি কোনরকমে সামলে নিতাম। বনগরওয়াড়ীর পাঠশালা মানে আদালত, পুলিশ, থানা, নগরপালিকা— একাধারে সবকিছু। মাস্টার মানে জজ, দারোগা, প্যাটেল-পাটোয়ারি, সেইসঙ্গে ডাকটিকিট বিক্রেতা। কিন্তু বনগরওয়াড়ীর ঝগড়া-মারামারি কখনও গ্রামের বাইরে যেত না। টিবির সামনে এসে দশজনে মিলে বসে ওরা সবকিছুর আপস-মীমাংসা করে নিত। মাস্টার, মুখিয়াজী, কাকুয়া প্রমুখ সমঝদার ব্যক্তিরা তাঁদের রায় দিতেন। দশজনের কথা অপরাধীরাও অস্বীকার করতে পারত না। তারা দণ্ড স্বীকার করেই নিত। অবশ্য রায় না মানলে আপীলের ব্যবস্থা ছিল। আপীল মানে মেষ-পালকদের গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করা। কিন্তু এরকম কেউ করত না। কারণ মহাদেবতাকে আনতে গেলে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই রকম বড় ভোজের অর্থই প্রচুর খরচ।

একসঙ্গে সবার বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজও এই গ্রামে ছিল। প্রত্যেক বছর একটা সময় দেখে, ঐ দিন বিবাহযোগ্য সব ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। এই কারণে সারা গ্রামকে খাওয়ানোর খরচ একজনের ওপর পড়ত না, দশ-বারোটা বিয়ে হলে এক-একজনের ভাগে পনেরো-কুড়িজনকে খাওয়ানোর ভার পড়ত। এই বিয়েতে যদি কারও পয়সার জন্য আটকে যেত তবে গাঁয়ের সকলে মিলে সাহায্য করে তাকে উদ্ধার করত। বেশ ভাল ভাবেই বিয়ে হয়ে যেত।

দাদুর সেই ধমকের পরোয়া না করে আমি গাঁয়ের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেলাম। শেষে এমনই অবস্থা হল যে, মাস্টার ছাড়া গাঁয়ের কেউ একটা কুটো পর্যন্ত ভাঙে না।

বনগরওয়াড়ী গ্রামে চাষীদের সংখ্যা বেশ কম। মৃগনক্ষত্রের বর্ষার ফলে জমিতে ঘাসের অঙ্কুর দেখা দিল। বেশ ঘন ঘন ঘাস গজিয়ে গেল। বীজ বোনার আগে চাষীরা জমি থেকে সেই সব বাজে ঘাস নিড়ানি দিয়ে উপড়ে ফেলে দিল। এরপর শুরু হল পুষ্প নক্ষত্রের বর্ষা। ধানের ক্ষেতে কাদা জমে গেল। নালা কেটে জল সরিয়ে দেওয়া হল। জল সরে গেলে কাদা শুকিয়ে গেল। জমি শুকিয়ে এমন খটখটে হয়ে গেল যে গরুর খুর পর্যন্ত তাতে আর বসে না। জমির ভেতর দিকে নরম থাকলেও ওপরটা শুকনো। তখন আবার চাষের জন্য জমিতে লাঙল দেওয়া শুরু হল। বাজরা ও ডালের চাষ শুরু হল। বীজের পুঁটলি হাতে নিয়ে বলদে জোয়াল জুতে ভোরবেলা উঠেই মাঠে বেরিয়ে পড়ল।

চাষবাস নিয়ে যখন এই ধরনের ছুটোছুটি চলছে তখন শেকু একদিন আমার কাছে এল। ওকে গ্রামে বেশী দেখা যেত না। ওর দুই-এক একর যা জমি ছিল তাই নিয়েই ও কাটাত। সকালের দিকে গায়ে কাপড় জড়িয়ে শেকু আমার কাছে এল। ওর হাত দেখা যাচ্ছিল না। ধুতিটা এমন ভাবে পরেছিল যাতে করে তার শুকনো দেহ, আর বড় বড় নখওয়ালা পা দেখা যাচ্ছিল। সেসময় আমি আর আয়বু বসেছিলাম।

শেকু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "মাস্টার, আমাকে একটা বলদের সন্ধান দাও। আমার চাষবাস যে বন্ধ হয়ে গেল।"

আমি পাঠশালার মাস্টার। আমার কাছে বলদ কোথা থেকে আসবে? শেকু অবশ্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ কথা বলে নি। সে বলল, "তুমি যদি চাও তাহলে বলদ পেয়ে যাবে। আমার কাছে

একটাই আছে। একটা মরে গেছে। আর-একটা পেলে চাষটা করতে পারি। তা না হলে সারা বছর না খেয়ে মরতে হবে।"

আমি বললাম, "কার কাছে বলদ আছে বল, আমি চেয়ে দেব।"

"যাদের আছে তারা এখন নিজেরাই চাষবাস করছে। নিজেদের ক্ষতি ক'রে কে আর আমাকে দেবে? আমি সবার কাছেই চেয়ে এসেছি।"

"তাহলে আমিই বা কার কাছে চাইব বল?"

"সে তুমি যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও। সারা গ্রামের লোক বলে বিপদে পড়লে মাস্টার আছে। বিপদের সময়ই লোক চেনা যায়। তবে আমার বেলাতেই বা এরকম করছ কেন?"

আয়বু এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে ছিল। সে শেকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই পাগল হয়ে যাসনি তো শেকু? মাস্টারের কাছে গরু আসবে কোথা থেকে? মাস্টার কি চাষা? তোর কোন জ্ঞানগম্যি নেই, কিছু না ভেবেই চাইতে চলে এসেছিস? যা, বাড়ি যা।"

আয়বুকে ধমকাতে দেখে শেকু নীচে নেমে এল। তার মনে হল, সে কোন অন্যায় কিছু করে নি। গলার স্বর নামিয়ে সে বলল, "বাড়ি তো যাবই। কিন্তু মাস্টার, দেখো, যদি পাও।" আয়বু এবার রেগে গিয়ে শেকুর হাত দুটো ধরে তাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে বলল, "তুই একটা আচ্ছা হাঁদারাম শেকু। মাস্টার কি বলদ গাঁঠে বেঁধে রেখেছে?" শেকু বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে চলে গেল।

আয়বু ফিরে এসে বলল, "মাস্টারমশাই, ওটার কথা কিছু ধরবেন না। ও একটা পাগল।" আমার বার বার মনে হতে

লাগল, আমি তো কেবল গ-ম-অ-ম— এই সবই ওদের শেখাচ্ছি। কিন্তু ওদের আসল প্রয়োজনটা অন্য। আয়বুর গৃহস্থী চাই, আনংদার রুটি চাই, শেকুর বলদ চাই।

দুদিন ধরে শেকু সব জায়গা ঘুরে কোন গরু জোগাড় করতে না পেরে ধপ করে বসে পড়ে বউকে বলল, "আমার তো আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।"

শেকুর স্ত্রী গাঁয়ের অন্যসব বউদের চেয়ে অন্তত আধহাত লম্বা। শরীরে শক্তিও প্রচুর। ও ছেলেদের সমান ক্ষেতের কাজ করতে পারত। স্বামী যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, তখন সে বলল, "কার কার কাছে গরু চেয়েছিলে?"

"সারা গ্রাম ঘুরে এসেছি— কেউ গরু দেয় নি।"

"তাহলে কী হবে?"

"এ বছর না খেয়ে মরতে হবে।"

স্বামীর কথাগুলো শেকুর বউ কান পেতে শুনল। প্রদীপে তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপ যেমন দপ দপ করে জ্বলে, তেমনি ভাবে ওর চোখ জ্বলতে লাগল আর ও সাহসের সঙ্গে বলল, "কাল কিন্তু জমিতে লাঙল দিতে হবে।"

"বলদ কোথায় পাব?"

"আমি নিয়ে আসব।"

"কোথা থেকে আনবে?"

"যেখান থেকে হোক আনব।"

"তবুও..."

"তোমার তা দিয়ে কি দরকার? আমি ঠিক বলদ নিয়ে আসব। তুমি ভোরবেলা উঠে মাঠে চলে যাবে।"

বউ কোথা থেকে বলদ আনবে, এসব ভাবতে ভাবতে শেকু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এক হাতে লাঙল আর অন্যহাতে একটা বলদ নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। শেকু রাস্তার মোড়ে বউয়ের পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল শেকুর বউ আসছে। ওর সঙ্গে কিন্তু বলদ ছিল না। শেকুর মুখ নীচু হয়ে গেল। বউ বলে গিয়েছিল বলদ নিয়ে আসবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও বলদ পেল না। আর তাহলে চাষ হবে না। সবার হয়ে গেলে পরে বলদ পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে কি লাভ? তখন চাষ করলেও সে ফসল ভাল হবে না। গাছ বড় হবে না। সারা বছরের তরি-তরকারি না হলে না খেয়ে থাকতে হবে। নিজের গ্রাম ছেড়ে ভিন গাঁয়ে গিয়ে শাক ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতে খেটে-খাওয়া শেকুর মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল। আর তার মোটাসোটা বউ ক্ষেত থেকে বাড়ি এসে পৌঁছল।

"কী গো, বলদ পাওয়া গেল না?"

"পাওয়া যাবে না কেন? লাঙল ঠিক কর।"

"কিন্তু বলদ কোথায়?"

"আমি তো আছি। একদিকে বলদ লাগাও আর-এক দিকে আমি টানব।"

বউয়ের এই কথা শুনে শেকু চমকে উঠল। বউ কি বলছে সে বুঝতে পারল না। "দূর সে কী করে হয়?"

কিন্তু স্ত্রীলোকটি একেবারে মনস্থির করেই এসেছিল। নিজের শক্তির ওপর তার বিশ্বাস ছিল।

"তা-না-না কোরো না। লাঙল জোত।"

স্বামীকে কিন্তু জায়গা ছেড়ে একটুও উঠতে দেখা গেল না। সে মাথা নীচু করে বসে রইল। তাই দেখে ওর বউ উঠে গিয়ে নিজেই বলদটার কাঁধে জোয়াল জুতে দিল। জোয়ালের আর-একটা দিক সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এখন টানো।"

বুকে যেন পাষাণ বেঁধে, দুর্বল দেহটা তুলে স্বামী বলদের লেজটা মুঠো করে ধরে ইশারা করল। বলদ আর তার বউ দুজনেই চলতে শুরু করল। লাঙলের ফাল নরম মাটির মধ্যে বসে মাটির বুক চিরে এগিয়ে চলল। শেকু বাজরা ভরতি মুঠো খুলল। বাজরা গিয়ে পড়তে লাগল নীচের মাটিতে।

শুধুমাত্র মনের জোরে শেকুর বউ বলদের সঙ্গে লাঙল চালাতে লাগল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেকু বীজ বুনে গেল। তারপর সে ও তার পরিশ্রান্ত বউ দুজনে বসে রুটি খেয়ে নিল। শেকু কোন কথা বলল না। ওর বউ দু-চার কথা বলল। ফের দুজনে মিলে জমিতে মই দিয়ে মাটির নীচে বীজগুলি বেশ করে মিশিয়ে দিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনজন ক্ষেতে কাজ করল। তারপর সূর্য অস্ত গেলে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল।

এ খবর গ্রামে চাউর হয়ে গেলে সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। তারা বাহবা দিল। এর মধ্যে কারও কথা বা আন্তরিক, কারও বা শুধু মৌখিক। রাত্রিবেলা পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার সময় আমি কিছুক্ষণ গিয়ে শেকুর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে হ্যারিকেনের আলোয় শেকুর বউ দেওয়ালের দিকে ফিরে আধ-

শোওয়া অবস্থায় ছিল আর ওর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে শেকু তার পিঠ দলাইমলাই করে দিচ্ছিল। শেকু দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে একটা পা উঠিয়ে স্ত্রীর ব্যথায়-ভরা পিঠ একটু একটু করে মাড়িয়ে দিচ্ছিল।

দশ

শনিবার পাঠশালা ছুটির পর বাড়ি গিয়ে ছয়ক্রোশ রাস্তা হেঁটে আবার যখন বনগরওয়াড়ী ফিরে এলাম, তখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এই যাওয়া-আসার ব্যাপারটা সত্যিই খুব ক্লান্তিকর। শারীরিক শ্রমের কথা বাদ দিলেও ওই উঁচুনীচু অসমতল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসাটা বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। পাঠশালার ছুটির পর বার হতে হতে দশটা-এগারোটা বেজে যেত। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে যেত। বাড়ি ফিরে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে শুতে শুতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। রবিবার সকালে খাওয়া হতে না হতে, দিন শেষ হতে না হতে আমার আবার ঘরে ফেরার কথা চিন্তা করতে হত। রাত্রিবেলা শোওয়ার সময় বারবার মাকে বলে রাখতাম, "মা, খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা দিতে হবে। পরোটা বানিয়ে রেখো।" বেচারী মা এক ঘুম দিয়েই উঠে পরোটা বানাতে বসত। আর ভোরের তারা থাকতে থাকতেই আমি পরোটার ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বনগরওয়াড়ীর পথ ধরতাম।

প্রতি শনিবার মা-বাবার কাছে গিয়ে আবার একদিন বাদে বনগরওয়াড়ীতে ফিরে আসা মোটেই আরামের ছিল না। কিন্তু তবুও শনিবার হলেই মনে হত মায়ের কাছে যাই। সত্যি ঘরের প্রতি টান এক অন্য জিনিস।

আমার এই কষ্ট দেখে আয়বুরও দয়া হত। সে বলত, "মাস্টার-মশাই, তুমি কবে সংসার পাতবে ?"

"কেন রে ?"

"তোমার খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। এবার বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার কর।"

আয়বুর মতে বিয়ে করে ঘর-সংসার করাটা খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা লাঘবের জন্য। নয়তো তার মতে বিয়ের আর অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ও বেচারার যা মনে হয়েছে তাই-ই ও বলেছে। নিজের হাতে রুটি তৈরি করে খেতে কোন্ পুরুষ-মানুষেরই না কষ্ট হয়। কিন্তু শুধুমাত্র এর জন্য সবকিছু ছেড়ে বিয়ে করায় আমার কিছুতেই মন চাইত না। খুব কষ্ট হলে, আমি দু-এক সপ্তাহ বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিতাম। যদিও বা যেতাম, তাহলে সোমবারের বদলে মঙ্গলবার ফিরতাম। তা না হলে বড় কষ্ট হত।

এবার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠ থেকে ভেড়ার পাল তখনও ফেরে নি। আমি এবার আসার সময় রামার [illegible] টাকা ভাঙিয়ে এনেছিলাম। পকেটের থলের ভেতর অতগুলো টাকা বোঝা হয়ে আমার মাথায় চেপেছিল। থলেটাকে খুব শক্ত করে ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাব-ছিলাম, এখন যদি কোন ডাকাত আমার এই টাকাগুলো ছিনিয়ে

নিয়ে যায়, তবে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমি বারবার আগুপিছু তাকাতে তাকাতে জোরে জোরে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিলাম। গ্রামে পৌঁছবার পর আমার সব বোঝা, সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। ঘরের দরজা খুলে প্রদীপ জ্বালিয়ে হাত-পা ধুয়ে এসে কিছুক্ষণ বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর পা ছড়িয়ে বসার মধ্যে যে কী আরাম তা অনুভব করার জন্য এভাবে বসা দরকার।

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার জন্য দেওয়ালে ছেতলা ধরে গেছে। দু-চার দিন ঘর বন্ধ থাকায় ঘরে হাওয়া বাতাস আসতে পারে নি, চারিদিকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরের কোণ থেকে মশার দল বেরিয়ে পড়ে গুন গুন শব্দ শুরু করে দিয়েছে। আমি খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। চোখ জুড়ে আসছিল। কিন্তু সন্ধ্যা দেওয়ার এই সময়টা ঘুমনো ঠিক নয়। মা লক্ষ্মীর আসার সময়টা ঘুমিয়ে থাকাটা দারিদ্র্যের লক্ষণ।

কিন্তু ভাগ্যবান মানুষের পক্ষেও তার না ঘুমিয়ে উপায় কী। শরীর দরিদ্রের যেমন, বড়লোকেরও তেমনি। ক্লান্ত হয়ে যাবার পর সকলেই আরাম চায়। আর আরাম করতে চাইলেই ঘুম এসে পড়ে। অবশ্য এটা মোটেই সংগত ব্যাপার নয়।

বসে ছিলাম। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লাম। সারা শরীরে ব্যথা। হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে রইলাম। জোর করে চোখ বন্ধ করলে চোখের সামনে গোল গোল নানান রঙের কী সব এসে জড়ো হয় কেন? কমলা, নীল, হলুদ, এইসব রঙ চোখে পড়ে। এ কথা যদি পাঠশালার কোন পড়ুয়া জিজ্ঞাসা করত তাহলে মাস্টারের আসল জারিজুরি ধরা পড়ে যেত। হয়তো এর উত্তরটা খুবই সোজা, কিন্তু আমার জানা নেই। মিড্‌ল্ ক্লাস পর্যন্ত পাস

করা ছোকরা মাস্টার আর কতটুকু জানবে? কিন্তু ছেলেরা প্রশ্ন করলে বিপদ হবে মাস্টারের। তবে এসব কথা ওঠার সম্ভাবনাই নেই। কারণ বনগরওয়াড়ীর ছেলেরা অতখানি চালাক-চতুর নয়। কিন্তু একজন মাস্টারের পক্ষে এর কারণটা জেনে রেখে দেওয়া দরকার। চোখের আকৃতি কী রকম? এসব প্রশ্ন তো স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে এসে গেছে। হাঁ, পড়া জিনিসই মানুষের তাড়াতাড়ি মনে থাকে না। আমার চোখ এবার বুঁজে এল। আর কিছুতেই চোখের পাতা খুলতে ইচ্ছা করল না।

ঘণ্টা চারেক পরে যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম তখন দেখি রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর তখনও প্রদীপ জ্বালা হয় নি। বাহিরের খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে এসে ঢুকছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একে একে সব মনে পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠে শিয়রের দিকে হাত বুলিয়ে দেখলাম, থলির ওপর হাত পড়ে গেল। কিন্তু তার মধ্যে পয়সার পুঁটলিটা নেই। আমার বুক কেঁপে উঠল। অন্ধকারের মধ্যেই আমি বার বার থলিটা হাতড়াতে লাগলাম। জামাকাপড় সব টেনে বার করলাম কিন্তু কোথাও টাকার কঠিন স্পর্শ হাতে ঠেকল না। পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাঠি ধরিয়ে হ্যারিকেনে তেল পুরলাম। তারপর হ্যারিকেন ধরালাম। পাগলের মত ঝোলা, বিছানা ঘরের মেঝে সব উলটে পালটে খুঁজতে লাগলাম।

পয়সা হারিয়ে যাবার পর চার-পাঁচ দিন এভাবে কেটে গেছে। আমি রোজ কাজকর্ম করে চলেছি। খাচ্ছিদাচ্ছি, পাঠশালায় যাচ্ছি। রাতের বেলা আমার সামাজিক মজলিশেও বসছি।

কিন্তু পয়সাগুলো যে গায়েব হয়ে গেল, তা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না। যত চিন্তা করছি ততই নানান আশঙ্কা মনে জাগছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পয়সার থলিটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম তো? পথে আসার সময় বিশ্রামের জন্য যেখানে বসেছিলাম তখন তো সেখানে পড়ে যায় নি? সাবধান হতে গিয়ে আমি পুঁটলি আর পরোটা একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। কারণ রাস্তায় যদি কোন গুণ্ডা বদমায়েস ধরে তাহলে আমার কাছে রুটির থলি ছাড়া কিছুই পাবে না।

এখন তো পরোটাও গেছে, পয়সাও গেছে। পরোটার গন্ধে গন্ধে কোন কুকুর থলেটা নিয়ে যায় নি তো? বোকা বোকা চেহারার আয়বুও হয়তো নিতে পারে। কিন্তু ওকে দেখে তো অমন মনে হয় না। ওর ব্যবহারে কোন সন্দেহই হয় না। তবে ঘরে ঢুকে কে পয়সা বার করে নিল? চব্বিশটা ঘণ্টা ধরে এই চিন্তা আমার মনের ভেতর কাঁটার মত বিঁধছিল। রামা আমাকে বিশ্বাস করে যে টাকা ভাঙাতে দিয়েছিল, তা আমি গাঁ থেকে ফেরার পথে হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু টাকা আমি নিজে আত্মসাৎ করিনি। এমন চিন্তাও কখনও আমার মনে আসেনি। কিন্তু রামা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে? কাল যদি আমি গিয়ে বলি, দেখ তোমার পয়সা ঝোলা থেকে কে চুরি করে নিয়েছে, তখন ও নিশ্চয়ই বলবে যে পাঁচ-দশটাকা ভজিয়ে দিয়ে লোকটা সৎ মানুষ সেজেছিল কিন্তু যেই বেশী টাকা হাতে পেয়েছে অমনি আর লোভ সামলাতে পারেনি। হয়তো নিজের বাড়িতেই পয়সা রেখে এসেছে। আমাদের গ্রাম্য মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে মাস্টার নিজের পকেট ভরতি করেছে— স্বাভাবিক ভাবেই রাম একথা বলবে। যে

সততার সুনামটুকু অর্জন করার জন্য আমি এখানে এত পরিশ্রম করছি একথা শুনলে সবাই হাততালি দেবে। একথা মনে হতেই আমার মন বড় বিচলিত হয়ে উঠল। কেন যে এতগুলো টাকা ভাঙাবার দায়িত্ব নিলাম। যদি উপায় থাকত তাহলে নিজের গাঁটের থেকে রামার পয়সা পূরণ করে দিতাম। রামাকে জানতেই দিতাম না যে তার টাকা চোর নিয়েছে। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। চারদিকের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে গেলে আমি ভাবতে লাগলাম, পয়সাগুলো কোথায় গেল ? কী ভাবে গেল ? আর থেকে থেকে মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে দাতুর কোন ষড়যন্ত্র নেই তো ? বার বার ভাবছি, মাস্টারের সম্মান নষ্ট করার জন্য সেই-ই চুরি করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারলাম না যে ও এতদিন কেন চুপ করে ছিল। বাড়ি থেকে ফেরার পর রামার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়নি তা নয়। ও পাঠশালাতে এসেছে ; কিন্তু পয়সার নাম একবারও করেনি। রামা ভাবত মাস্টারের কাছে পয়সা থাকাও যা ঘরের সিন্দুকে পয়সা রাখাও তাই। হয়তো মাস্টার এখনও টাকা ভাঙায়নি, ভাঙালে নিজেই আমাকে দিয়ে আসত। তবে শুধু শুধু টাকার কথা জিজ্ঞাসা করব ?— এই সব নানান কথা ভেবেই রামা একবারও পয়সার কথা তোলেনি। আর আমিও সে প্রসঙ্গ পাড়িনি। কিন্তু আমার যেন নিজেকে চোর মনে হতে লাগল। ভাবলাম, রামার মুখোমুখি আর হব না। ওর সাথে আর কথাও বলব না। এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, তাহলে আর কারও সাথে দেখা হবে না। এ সব যত ভাবতে লাগলাম, মনটা তত খারাপ হয়ে গেল।

এর মধ্যে মুখিয়াজীর সেই কালো মতন নাতনিটি শাড়ি দুলিয়ে

আমার কাছে এল। তখন ঘরে আমি একলা বসে। সে দরজায় উঁকি মেরে দেখল। একবার, দুবার, তিনবার উঁকি দেওয়ার পর মুখে হাত দিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, "কে ওখানে?"

"আমি অঞ্জী।"

"কে, মুখিয়াজীর নাতনি অঞ্জী?"

"হ্যাঁ।"

"কী দরকার? ভেতরে এস-না!"

অঞ্জী সলজ্জ পায়ে ভিতরে এল।

বাড়িতে কাটা চরকার সুতোয় তৈরি লাল শাড়ি তার পরনে। সঙ্গে সবুজ চোলী। গাঁয়ের মুখিয়াজীর বাড়ি কখনও কখনও ওকে হয়তো দেখেছি। ওর রূপ যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তা আমার তখন মনে হয়নি। চোদ্দ পার হয়ে ও পনেরোয় পা দিয়েছে, কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে বয়স বিশ বছরের কাছাকাছি।

অঞ্জী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ীর আঁচল ঠিক করছিল। সে একটু তাকিয়ে বলল, "সদর মহকুমায় কবে যাচ্ছেন মাস্টার মশাই?"

হপ্তা শেষ হয়ে গেছে। আগামী কালই শনিবার। অন্য কোন কাজের জন্য না হলেও রামার পয়সা খোঁজার জন্যও আমার গ্রামের বাড়ি যাবার প্রয়োজন ছিল।

"কাল সকালে যাব। কেন?"

"আমার একটা কাজ করে দেবেন?"

শনিবার দিন অনেক লোকেরই আমার সঙ্গে কাজ থাকত। কারও ওষুধ আনা, কারও টাকা ভাঙিয়ে আনা, কেউ আমাকে দিয়ে মানি অর্ডার করতে দিত। কারও বা চিঠি লিখে দিতে হত।

"বলো না, করার মত কাজ হলে নিশ্চয়ই করব।"

অঞ্জী বলল, "আমার জন্য একটা চোলী বানিয়ে এনে দেবেন?"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে দেখলাম যে ও ওর গায়ের মাপের একটা পুরনো চোলী আর একটুকরো কাপড় আমার সামনে এনে ফেলে দিল।

"চুরি করে বানাচ্ছি। আমার দাদুকে একদম বলবেন না। কাজ করে পয়সা জমিয়ে সে টাকায় এই কাপড় কিনেছি। ছমাস হয়ে গেছে, কিন্তু সেলাইর মজুরির টাকাটা আর জমাতে পারছি না। আপনি সেলাই করে নিয়ে আসুন, আমি পরে টাকাটা দিয়ে দেব।"

আর হ্যাঁ, না, কোন কথা না বলে অঞ্জী কাপড় আর চোলীটা দিয়ে চলে গেল।

এগারো

শনিবার দুপুরে বাড়ি গিয়ে সুযোগ বুঝে বাবার কাছে পয়সা হারাবার কথা বলেই ফেললাম। আমার সব কথা চুপ করে শুনে বাবা আমাকেই দোষ দিয়ে বললেন : কেন আমি টাকা-পয়সার দায়িত্ব নিতে গেলাম।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললাম, "আমি ওর বিশ্বাস অর্জন করতে চেয়েছিলাম, এইজন্য এত টাকার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তোমার এটা ভাবা উচিত ছিল যে যদি এত পয়সা তোমার হাত থেকে কিছু হয়ে যায় তবে তা পূরণ করে দেবার ক্ষমতা তোমার নেই, তোমার বাড়ির লোকদেরও কারও নেই। ও যদি টাকা না পায় তাহলে এতদিনের অর্জিত সব বিশ্বাস এক কথায় কোথায় উবে যাবে।"

"তা তো হবেই। আমারই ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কী করা যায় আপনার কাছে তার পরামর্শ চাইছি।"

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিনা প্রয়োজনে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো বাবা একেবারেই পছন্দ করেন না। নিজে আর নিজের কাজই তাঁর কাছে ভাল। বিশেষ করে টাকাপয়সার মত দায়িত্ব নিয়ে তিনি কখনই ঝামেলায় পড়তে চান না। তিনি প্রায়ই বলতেন, টাকাপয়সার জন্য অনেক সময় বদনাম হয়ে যায়। তাই গায়ে পড়ে এই বিপদ ডেকে আনবার জন্য উনি প্রথমে আমাকে খুব বকলেন। পরে তাঁর নিজেরই মনে হল যে ছেলেটিকে একথা বলা উচিত হবে না যে তোমার কর্ম, তুমি ফলভোগ কর।

উনি বললেন, "তুমি মালিককে সাফ সাফ বলে দাও যে পয়সা চুরি হয়ে গেছে, এবং তা হয়েছে তোমাদেরই গাঁয়ে। সবাই মিলে খোঁজ। তাহলে চোর পাওয়া যাবে। সে যদি খুব রাগারাগি করে তাহলে বলবে আমি চালচুলোহীন লোক নই। আমার ঘর-দোর-খেত আছে। আমি সরকারী চাকরি করি। তোমার পয়সা ফেরত দিয়ে দেব।"

উনি সব কিছু বুদ্ধি দিলেন। আমিও তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে বার বার মনে হতে লাগল, যে এ কথা আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারব না। রামাও এ কথা বিশ্বাস করবে না। গাঁয়ের

লোকেরাও এ কথা সত্যি বলে মনে করবে না। পুলিশে খবর দিলেও পুলিশ এসে গাঁয়ে হামলা বাধাবে। যাকে তাকে ধরে মারধোর করবে। সমস্ত গ্রামেরই তাতে কষ্ট হবে। তার থেকে ভাল পয়সা হারাবার কথা না বলে নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে দেওয়া আর কান ধরে প্রতিজ্ঞা করা যে আর এমন দায়িত্ব নেব না। নিজের গাঁটের থেকে টাকা দেওয়ার কথা আমি মনে মনে পাকা করে ফেললাম। পয়সা কোথায় পাব, তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু পয়সা পাবার কোন রাস্তাই খুঁজে পেলাম না। তিন-চারজন বন্ধু ও দু-একজন মহাজনের কাছে চেয়েও পেলাম না। তাঁরা কেউই আমার মত অল্পবয়সী একজন ছেলেকে পয়সা দিতে রাজি হলেন না। কেউ বলল, বাবাকে জামিন হতে হবে। কেউ স্রেফ মুখের ওপরেই বলে দিল হবে না। ঘুরে ঘুরে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম। তিনশ সাড়ে-তিনশ টাকাও একসঙ্গে জোগাড় করতে পারলাম না। আমার কাছে এটি বড় খারাপ লাগল। মাথা একেবারে হেঁট হয়ে গেল। রবিবার রাতে আমি খাবার খেলাম না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। আমার এই ছটফটানি মা বুঝতে পেরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে আমার কাছে এল।

খুব আস্তে আস্তে মা আমাকে বলল, "রাজারাম এখনও পর্যন্ত জেগে আছ নাকি?"

আমি বললাম, "হুঁ।" আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কোমল হাতের স্পর্শ আমার কপালে লাগল।

"ছাখো, যে পয়সা গেছে, তা কি আর পাওয়া যাবে, শোনো, মেষপালকরা যদি তোমাকে খুব বিরক্ত করে তাহলে তোমার মামার

বাড়িতে আমার যে জমি আছে তা বেচে দাও। ওটা বেচলে চার-পাঁচশ টাকা হয়ে যাবে। ওকে দিয়ে দাও। এত চিন্তা করার কী আছে ?"

মায়ের এ কথা শুনে আমার সাহস বাড়ল। চিন্তা দূর হয়ে গেল। তাহলে আমার পিছনে কেউ আছে। যদি দরকার হয় তাহলে রামার টাকা ফেরত দিয়ে দিতে পারি। এই আশ্বাস পেয়ে মন থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল।

যে কথা ভাবছিলাম, তা গ্রামে গিয়ে আজ রাতে গ্রামের মজলিশে গিয়ে বলব বলে ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু দুটো ব্যাপারের জন্য মনটা আবার খুঁত খুঁত করছিল। এক, মায়ের নিজের নামের বাড়ি ও জমিটা বেচে দিতে মন চাইছিল না। দ্বিতীয়ত, পয়সা হারানোর কথাও রামাকে বলতে মন চাইছিল না। ঠিক ফাঁসীর আসামীর মত মানসিক অবস্থা নিয়ে, কোন ভয় করব না ব'লে মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি সোমবার ভোরে বনগরওয়াড়ী রওয়ানা হয়ে গেলাম।

সোমবার পাঠশালার ছুটির পর ঘরে ফিরে এলাম। ঠিক করলাম, রাতের বেলা যখন গ্রামের লোক এই ঢিবিটার ওপর জড়ো হবে তখন তাদের সকলের সামনে পয়সা চুরি যাবার কথাটা বলব।

তবে এসব বলার আগে একবার মুখিয়াজীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেব ঠিক করলাম। আয়বুকে দিয়ে তাকে ডাকতে পাঠালাম। বলে দিলাম, গিয়ে বল, মাস্টারমশাইর খুব জরুরি দরকার। একবারটি যেন আসেন। আয়বু চলে গেলে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, যা হয়ে গেছে, সে সব কথা বুড়োকে কী ভাবে বলব। এতসব চিন্তার পর মনে হতে লাগল এই চুরির মামলা আমাকে কোন বিপদেই

ফেলবে না। বড় জোর এ নিয়ে কিছু কথা হবে। বেশী কিছু হবার আগেই বিপদ সহজেই কেটে যাবে। শুধু শুধু আমি এত সব চিন্তা করছি। হয়তো পয়সা চুরিই হয়নি। কোথাও হারিয়ে গেছে বা কোথাও পড়ে গেছে।

আমার মনে কেন যে এমন হচ্ছিল সত্যি বলতে পারব না। কিন্তু মনে যে হচ্ছিল এ কথা সত্যি। এ ব্যাপারে আমার কোন বিপদ হবে এ কথা সত্যিই আমার মনে হচ্ছিল না।

আয়বু বুড়োর কাছ থেকে অপ্রসন্ন মনে ফিরে এল। আয়বু যখন কোন ব্যাপারে অপ্রসন্ন হয় তখন ওর মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়, গাল ফুলে যায়, আর হাত দুটো জোড়া করে ও বুকের ওপর তুলে ফেলে। ও ঘরের ভেতর এলে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী, বুড়োর সঙ্গে দেখা হল না?'

'দেখা হবে না কেন? ও আর এমন কি লাটসাহেব।'

"হ্যাঁ, তা কী বলল?"

"বলল, যাব না, গিয়ে তোমার মাস্টারকে বোল, আমার সময় নেই। যেদিন সময় পাব সেদিন যাব।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার শরীর হিম হয়ে গেল। বুড়োর কাছ থেকে এরকম উত্তর পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সব সময় মাস্টার মাস্টার করা, সমঝদার বিচক্ষণ স্নেহশীল মুখিয়াজী যে এমন কর্কশ উত্তর দেবে তা আমার কল্পনাতেও আসছে না। আমি আয়বুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাট্টা করে বলেছে না সত্যি সত্যি বলেছে?"

"সে ঠাট্টা করবে কেন? সত্যি সত্যি ভেবে চিন্তেই বলেছে।"

আয়বুর গাল রাগের চোটেই ফুলে উঠল। মাস্টারের ডাকে

সাধারণ মেষপালক এমন জবাব দিয়েছে দেখে, কথাগুলো তার হৃদয়ে তীরের মত গিয়ে বিঁধেছে। একটু থেমে ও বলল, "আপনার ওপর ও খুব রেগে আছে বলে মনে হয়।"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বুড়ো কেন রেগে গেছে?

আমার আবার কী অপরাধ হল?

তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে নিয়ে আমি বুড়োর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

উনুনের ধারে রাখ প্রদীপের আলোর সামান্য ছটা ঘরের ভেতর এসে পড়েছিল। উনুনের ধোঁয়ায়, সারা ঘরে ভরে গেছে। অঞ্জী রাত্রে খাবার রুটি সেঁকছিল। আমি যাওয়ামাত্র একবার চুরি করে আমার দিকে তাকাল। এভাবে তাকানোর অর্থ হল যে চোলি সেলাই করতে দেবার কথাটা আমি যেন না বলি। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু মুড়ে বুড়ো চুপ করে বসেছিল। আমাকে একবার 'আসুন' পর্যন্ত বলল না। ঐখানে দাঁড়িয়েই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বাবা, বিশ্রাম নিচ্ছেন?"

বুড়ো কেবল "হুঁ" বলে চুপ করে বসে রইল।

আমার খুব সংকোচ লাগল। ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া ছাদের দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অঞ্জীর পর্যন্ত বেশ অস্বস্তি লাগছিল। দু-একবার সে আমার দিকে আর বুড়োর দিকে আস্তে আস্তে তাকাচ্ছিল। ওর মুখে একটা অস্থিরতা ভাব ফুটে উঠছে। বুড়োর এই অদ্ভুত আচরণের অর্থও ও বুঝতে পারছিল না। উনানে দেবার জন্য বাইরের থেকে কাঠ চিরে আনতে হবে ছুতো করে সে বেরিয়ে গেল। বুড়ো আর আমি ঘরে রইলাম। বুড়ো যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইল আর আমি কী করব, কী বলব, না

বুঝে উঠতে পেরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। উনুনের আগুন নিবে গিয়েছিল। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল। উনুনের ওপর বসানো কড়াইর ডালের গন্ধ বেরুচ্ছে। টগবগ করে শব্দ হচ্ছে। দরজার ভিতর দিয়ে বাইরের হাওয়া আসায় প্রদীপের আলোয় শিখা দুলতে শুরু করেছে। দেওয়ালের ওপরের প্রদীপের কালো ছায়াও দুলছিল। আমার মুখে কোন কথাই আসছিল না। ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম আর খুব মিহি গলায় বললাম, "বাবা, আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই, একটা জরুরি কথা আছে।"

বুড়ো আমার কথায় কোন সাড়া দিল না।

অঞ্জী কাঠের বোঝা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর উনুন ধরাবার জন্য ঝুঁকে পড়ে কাঠের চোঙা ফুঁকতে লাগল।

বুড়ো কর্কশ আওয়াজ করে বলল, "তুমি চলে যাও। আমাকে কিছু বলতে এস না। আমি কিছু শুনতে চাই না।"

সে তাড়াতাড়ি উঠে প্রায় আমাকে ঠেলেই বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অপমানে আমার মুখ পাংশু হয়ে গেল। কানের লতি গরম হয়ে উঠল। আমি বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই অঞ্জী হালকা স্বরে বলল, "ওই হারামখোর দাহুটা বুড়োকে কি বলেছে!"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কী বলেছে?"

"কে জানে কী বলেছে। দারুণ আগুন লাগানো লোক ওই দাহুটা।"

আমি শুনলাম। যুবতী মেয়ের সঙ্গে একলা ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক কিনা ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আয়বু প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে বসেছিল। কিছুক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কথা বললাম না। কিন্তু আয়বুকে কথাটা না বলে থাকতে পারলাম না।

"দাছু কনয়ুসকে বুড়ো মুখিয়ার কাছে কী একটা বলেছে রে আয়বু। তার জন্যেই মুখিয়াজী এত রেগে গেছে আমার ওপর।"

আয়বুর মনে হল যেন হঠাৎ ও কিছু বুঝে ফেলেছে।

"ও এই কথা? হঁ্যা, আমার মনে পড়েছে। জানেন, মাস্টার, কনয়ুসকে আপনাকে খুব হিংসা করে।"

"কিন্তু হিংসা করার তো কোন কারণ নেই। আমি ওর কী ক্ষতি করেছি?"

"যেদিন থেকে আপনি গাঁয়ে এসেছেন, সেদিন থেকে ওর গুণ্ডামীকে আর কেউ আমল দেয় না।"

"ও গুণ্ডা নাকি?"

"তা নয়তো কি? ও তাহলে করে খাচ্ছে কী করে? এর টুপি ওর মাথায়, ওর টুপি এর মাথায় দিয়ে তবে তো ওর চলে। ও এক নাম করা গুণ্ডা।"

উপন্যাসের খলনায়কের মত এই কনয়ুসকে কেন আমার পেছনে লেগেছে আমি কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি। কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু প্রথম থেকেই ও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে চলেছে, যেন আমি ওর কোন শত্রু। ও যেন আমার জাত শত্রু। কাকের যেমন পেঁচার সঙ্গে, সাপের যেমন বেজির সঙ্গে শত্রুতা ঠিক তেমনি। আমি এখানে আসার পর ওর দাপট কমে গেছে, গাঁয়ের লোক এখন আর ওর কোন পরামর্শ নেয় না, এই কারণেই আমার ওপর

ওর এত রাগ। তাই বোধ হয় প্রথম সাক্ষাৎ হতেই ও আমাকে শাসিয়ে গেছে। সম্ভবত আমার আগের মাস্টার ওর প্রতি কোন অপরাধ করেছিল। তাই সমস্ত মাস্টার জাতটার ওপরেই ওর রাগ। কিন্তু আমার এতদিনের ব্যবহার দেখে ওর এই রাগ চলে যাওয়া উচিত ছিল।

আয়বু রুটি চেয়ে আনবার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল। প্রথমে তো রামার টাকার ব্যাপারে আমার ঘুম চলে গিয়েছিল। তার ওপর আবার কনয়ুসকের এই বদমায়েসী। প্রথম থেকে আমার পিঠে হাত রেখে কথা বলার মত গাঁয়ের একমাত্র লোক মুখিয়া পর্যন্ত আমার ওপর বিরূপ হল। ইতিমধ্যে আমার মনে হয়েছিল এই গ্রামের যাতে ভাল হয় তাই কিছু করি। আর তার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে গেল। মনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা পরোটার থালাটা খুললাম। তারপর একা একা বসে পরোটা খেতে শুরু করে দিলাম। নিজের খাওয়ার শব্দটাও আমার কানে বিশ্রী শোনাতে লাগল আর তখনই আনংদা রামোশী এসে হাজির হল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মাস্টারজী একলা বসে নাকি?"

"হ্যাঁ, একলা বসে আছি। কেন রে আনংদা?"

"খেয়ে নিন। আমি পরে আসব।"

"খাওয়া হয়ে গেছে। কেন কিছু দরকার আছে?"

আমি পরোটা ভাঁজ করে রেখে হাত ধুয়ে ফেললাম। আনংদা ভেতরে এল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চাপা গলায় সে বলল, "এই ঘর থেকে কি আপনার পয়সা হারিয়ে গেছে?" মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা মারল।

আমার এক কানের খবর যেখানে আর এক কান জানে না, সেখানে রামোশী এ কথা কী করে জানল? তার মানে ও জেনে গেছে যে পয়সা চুরি হয়ে গেছে। তার অর্থ হল, এতদিন ধরে নিজের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যা চেষ্টা করছি, সব আজ বিফলে গেল। ভাঙিয়ে আনবার জন্য রামা আমাকে যে টাকা দিয়েছিল তা যে আমি খেয়ে বসে আছি, এ কথা নিশ্চয় চাউর হয়ে গেছে। এখন একে সত্যি কথা বলব, না আজে বাজে অন্য কিছু বলব? আমি সম্পূর্ণ ঘাবড়ে গেলাম। আর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ্যাঁ, তোমাকে কে বলল?"

"আমি জানি।"

"কিন্তু কীভাবে?"

আনংদা বেশ শান্তভাবে বলল, "আমিই নিয়েছিলাম।" এ কথা শুনে আমি নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। বড় বড় চোখ করে আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আনংদা তার ধুতির গাঁট খুলে যে পয়সাগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেই জিম্মায় রাখা পয়সাগুলো আমার সামনে রেখে বলল, "যেভাবে নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক সেইভাবেই ফেরৎ নিয়ে এসেছি। নিন আপনার দায়িত্ব।"

আমি পয়সার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতে তুলে নিলাম। মনের থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল। আমার মনে হল, আমার এই সংকটের সময় এই আনংদা রামোশী ভগবানের বেশে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আনংদা আবার বলল, "গুনে দেখে নিন। আমি মোট তিনটাকা

দশ আনা খরচ করে ফেলেছি। ওটা আর ফেরৎ দেব না। কিন্তু তা বাদে আপনার যেমন টাকা তেমন আছে।”

রামোশীর ওপর আমার যেমন রাগ হল তেমনি তার প্রতি স্নেহও হল।

“আনংদা তুমিই তাহলে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে? কিন্তু টাকাটা আবার পেলে কোথায়?”

আনংদা বলল—

“খণ্ডোয়ার দিব্যি মাস্টারজী। আমি মেরে দেব বলে টাকাটা নিইনি। আপনার কাছে সেদিন রুটি চাইতে এসেছিলাম। আপনি তখন ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমন্ত লোককে কী করে জাগাব? রুটির যে পোঁটলাটা আপনি এনেছিলেন, সেটা আমার নজরে পড়ল। পরোটার গন্ধে আমার জিভে জল এসে গেল। ভাবলাম পোঁটলাটা ধরেই নিয়ে যাই। মাস্টার জেগে উঠে পোঁটলাটা না দেখে ভাববে হয়তো কুকুরে টেনে নিয়ে গেছে। এই ভেবেই আমি পোঁটলাটা নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। কিন্তু পোঁটলা খুলতেই দেখলাম রুটির সঙ্গে অনেক টাকা রয়েছে। অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখে আমার দারুণ লোভ হল।”

“তা তো হ'ল। কিন্তু এদিকে যে আমার গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলছে।”

“কোথায় ফাঁসির দড়ি? ভগবান আপনার সহায়। আমি জাত বাউণ্ডুলে। এতগুলো টাকা খরচ করা আমার পক্ষে এমন কোন কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু আট-দশ দিন ধরে পয়সা ঘরে রয়েছে আর বার বার মনে হচ্ছে যেন ভগবান বলছেন বাবা আনংদা, মাস্টারের পয়সা কেন নিয়েছিস? মাস্টার কি বড় জমিদার না

মহাজন? ওকে এভাবে বিপদে ফেলছিস কেন? তাই মাস্টারজী আজ ওই টাকা আপনার চরণে এনে হাজির করেছি। এখন আপনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করুন, নাহয় আমাকে জেলে নিন, আর নাহয় আমাকে ছেড়ে দিন।"

কথাগুলো আনংদা এত সহজভাবে, এত খোলামনে বলল যে আমি ওকে কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ছোটখাটো চুরি করে এই রামোশী একটা বড় বাড়ি পর্যন্ত করে ফেলেছে। কিন্তু এহেন লোক নিজে এসে পয়সা ফেরৎ দিয়ে গেল। আবার চুরি করবার জন্যই ও আমার ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু টাকা চুরি করতে নয়, রুটি চুরি করতে। টাকা নিয়ে যাবার ওর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ভুল করে টাকাটা ওর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ও বলছে আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ও টাকা ও ফেরৎ দিচ্ছে। কিন্তু ওর এসব কথা সত্যি নয়। আজ হোক, কাল হোক চুরির কথা জানাজানিই হয়ে যেত। এই কারণে ও আমার কাছে এসে সাধু সেজেছে। ছোটখাটো চুরি করে ও আট-পনেরো দিন বাদে মালিকের কাছে গিয়ে নিজেই স্বীকার করত। সেসব চোরাই মাল এত সামান্য যে দু-চারটে গালাগালি দিয়ে লোকে একে ছেড়ে দিত। বেশী কিছু বলত না। কেননা, আনংদা বলত, চাইলে কেউ দেয় না। সেইজন্যেই না বলে নিতে হয়। আর আমি তো বেশী কিছু নিই না। পেটের জন্য যেটুকু একেবারে নেহাৎ জরুরি সেটুকুই আমার চাহিদা। মনে করবেন গরুরা খায়, পাখিরা খায়, পোকামাকড়রা খায়, সেইরকম আনংদাও কিছু খেয়ে গেছে। এর জন্য দুঃখ করবেন না।

আনংদা আমার সামনে উবু হয়ে বসেছিল। আমার খুব রাগ

হল। মনে হচ্ছিল আর এই লোকটার কখনও মুখদর্শন করব না। ওর মূর্খতার জন্য আমাকে কম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে!

গত আট-দশ দিন ধরে আমার যে কীভাবে কেটেছে তা একমাত্র আমিই জানি। আমি জোরে চিৎকার করে বললাম, "খুব সেয়ানা তুমি তাই না? যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।" আনংদা কিছু বলল না। কানে গোঁজা আধ-পোড়া বিড়িটা বার করে প্রদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে সে চলে গেল।

আমি সোজা উঠে রামার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ওর পয়সা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রামা বলল, "আমার কোন তাড়া নেই মাস্টারজী। পয়সা আপনার কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তা।" আমি বললাম, "তা সত্যি।"

ইতিমধ্যে কী কী ঘটনা ঘটে গেছে তা ও জানে না। শেষে ফেরার সময় আমি রামাকে আন্তরিকভাবে বললাম, "টাকা-পয়সা বাড়িতে রাখবেন না। কোন কাজে খাটান। জমি কিনুন। আরও ভেড়া কিনুন। কিন্তু এসব দায়িত্ব ঘরে রাখবেন না। বিপদ কখন আসে বলে আসে না।" কিছুদিন পর দেখলাম, রামা ওই টাকায় ভেড়া কিনেছে। ওর গোয়াল ঘর বেশ বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে।

বারো

মাঠে মাঠে বাজরার চারারা বেশ বড় হয়ে উঠল। দানা পাকার সময় এসে গেল। সবুজ মাঠের মধ্যে ভুরা রঙের দানাগুলো দুলতে শুরু করেছে। দানার মধ্যে পিঁপড়ের দল সারি বেঁধে এসে বাসা করতে শুরু করেছে। বাজরার দানার নরম মিষ্টি রসের লোভে মৌমাছিরা গুন গুন করে উড়তে শুরু করে দিয়েছে। হলুদ বরণ প্রজাপতিরা বাতাসে গা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে বাজরার দানার ওপর বসতে শুরু করেছে। হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে বাজরার দানাগুলোকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে ফেলেছে। বাজরার সাথে সাথে বোনা ডালেরও দানা দেখা দিতে শুরু করেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ শুঁটি নজরে আসছে। কুলথা গাছ লক লক করে বেড়ে উঠেছে। খাড়া তুবর গাছের ডালে কালো কালো ফলগুলিতে দানা দেখা দিতে শুরু করেছে। বাদাম গাছে সাদা গাঁঠ দেখা দিতে শুরু করেছে। আল দেওয়া জমির ভেতর হস্তিশুঁড়ি ঘাসের সাদা নীলাভ শীষ বেরিয়ে পড়েছে। আর অতি দ্রুত বেড়ে ওঠা বাজরা গাছের দানাগুলি একটার সঙ্গে একটা লেপটে গেছে। আর এই কচি কচি দানাগুলো ঠোঁট দিয়ে খাবার জন্য পাখির দল ঝটাপটি লাগিয়ে দিয়েছে। ওই ছোট ছোট কচি দানাগুলোকে খাবার জন্য পাখিরা মনের আনন্দে লেজ নাড়ছে।

যাদের জমি ছিল তারা সবাই সকালবেলা উঠে জমি দেখা-শোনার জন্য ক্ষেতে চলে যেত। বনগরওয়াড়ীর মেয়ে ও বাচ্চারাও রুজি-রোজগারের জন্য পাশের গ্রামের ক্ষেত-খামারে কাজ করতে চলে যেত।

সবুজ সবুজ ঘাস খেয়ে ভেড়াগুলো একেবারে গোলগাল নধর হয়ে উঠেছে। বেশ চর্বি জমেছে ওদের গায়ে। এই সব ভেড়াদের যদি কোন মেষপালক বাজারে নিয়ে যেত তাহলে বেশ ভাল দামই পেত।

বাজরা বেশ ভাল মত পেকে উঠেছে। বাচ্চারা তাজা বাজরার দানা খেয়ে খেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছে। দশহরা এসে গেল। বাজরা গাছের নতুন দানা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। তারপর ফসল কাটার ধুম পড়ে গেল। পাঁচ মাস ধরে বেড়ে ওঠা লকলকে বাজরা গাছগুলো কাস্তের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

এলোমেলোভাবে ফেলে রেখে দিলে পাখি বা পিঁপড়েরা এসে খেয়ে নেবে এ কারণে এগুলি সব সমান করে জড়ো করে ঝোপড়ির মত রাখা হয়েছে। কিছু দানা চোট লেগে বা গরমের জন্য ফুটে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনদিন পরে বাজরার ঐসব বড় বড় আঁটি খুলে ফেলে ছোট ছোট গোছা করে এক-একটা গোছার সাথে লাগিয়ে রোদে রেখে দেওয়া হয়েছে। ভেজা দানা শুকোতে লাগল। সকাল সন্ধ্যা পাখির দল ওখানে ভিড় জমালো। যার বেশী দরকার সে দানা বার করতে আরম্ভ করল। বাড়ির জানোয়ারেরা বাজরার কুঁড়ো, ভুসি খেতে লাগল। বাড়ির লোকেরা বাজরার সবুজ রুটি খেতে শুরু করল। যাদের ঘরে খাওয়ার মত সংস্থান ছিল তারা

তাড়াহুড়ো করল না। অন্য কাজ করার জন্য বাজরা ভাঙাতে দেবার ব্যাপারটায় কেউ তাড়াহুড়ো করল না। কিন্তু আজ না হোক কাল তাদের বাজরার ছোট ছোট গোছা নামিয়ে ভাঙাতে দিতেই হবে।

ধীরে ধীরে ফসল কাটার সময় এসে গেল। শুকনো ডালের দানাগুলো শুকিয়ে ঝুম ঝুম করে শব্দ হচ্ছে। একে একে সমস্ত ফসল কাটা হয়ে গেল— বাদাম, কলাই। ফসলহীন শূন্য মাঠে জানোয়াররা নির্ভয়ে চরে বেড়াতে লাগল। ভেড়াগুলো এখানে ওখানে যা পাচ্ছিল তা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। কিছুদিন আগে যে ক্ষেত ছিল পাকা ফসলের রঙে লালে লাল সেই ক্ষেত আজ বিপর্যস্ত লণ্ডভণ্ড দেখাচ্ছিল।

খুব জোর ঠাণ্ডা পড়ে গেল। সকাল সন্ধ্যা লোকেরা কাঠ-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালায় আর তাতে আগুন পোহায়। প্রত্যেকের ঠোঁট, মুখ ঠাণ্ডার চোটে ফেটে গিয়েছে। মেষপালকেরা সবাই আপাদমস্তক কালো কম্বলে মুড়ে থাকে। কূপের স্বচ্ছ জল থেকে সকাল বেলায় বাষ্প উঠতে থাকে।

এরই মধ্যে শ্রাবণ মাসে বোনা জোয়ার বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে। কালো মৃত্তিকার আবরণ ভেদ করে জোয়ারের চারাগুলি হাঁটু পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। কোমর প্রায় ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। মাঝে মাঝে বোনা ছোলা গাছে জাম রঙের ফুল হাসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে জোয়ারের দানা ধরে উঠল। ছোলা গাছে ছোলা দুলতে লাগল। জোয়ারের সবুজ দানা খেয়ে খেয়ে জানোয়ারগুলো মোটা হয়ে উঠল। তাদের চেহারা চকচক করতে লাগল। শিং দিয়ে তারা মহানন্দে মাটি খুঁড়তে

আরম্ভ করল। পাকা গম আর সবুজ ছোলা খাবার জন্য বাচ্চার দল ফসল চুরি করতে লাগল। মালিকদের চোখ এড়িয়ে ভেড়া ছাগল সব জোয়ার গাছগুলিকে তছনছ করতে লাগল। ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষেতের ভেতরে সারাদিন ধরে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

জায়গায় জায়গায় খড়কুটোর আগুন জ্বলতে লাগল। ভোরের আকাশ আগুনের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। যুবতী মেয়েরা এইসময়টা ফসলের দানা খেয়েই কাটিয়ে দিত। বুড়োরা হামানদিস্তেতে দানাগুলোকে বেশ মিহি করে কুটে তারপর খেত। বউরা আর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দু-চারটে দানা মুখে পুরে দিত।

প্রত্যেক বছরই এইসময় ভিনদেশী পাখির দল যেন কোন আমন্ত্রণ পেয়ে এখানে চলে আসে। সূর্য উঠতে না উঠতেই দূর থেকে তাদের ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ কানে আসে। স্বচ্ছ নীল আকাশে শত শত পাখির দল ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে ওরা বড় বড় দল বেঁধে আলাদা হয়ে যায়। উঠানে বা ক্ষেতের ওপর দাঁড়িয়ে বাচ্চার দল তাদের দিকে তাকিয়ে সুর করে চেঁচাতে থাকে—

"সিকি ভাগ সারস, বারে টা বলদের হাল চালায়, হাল চালায়।"

এইসব পাখির দল যাতে ফসলের কোন ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য চাষীরা নীল আকাশের দিকে নিজেদের পাগড়ি তুলে ওদের ভয় দেখায়। সোরগোল লাগিয়ে দেয়। তবুও এইসব পাখির দল লম্বা লম্বা পা ফেলে ফসলের ক্ষেতে নেমে আসে আর সুযোগ বুঝে ফসল তছনছ করে জোয়ারের দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। তিন-তিনটে মুর্গির সমান ওজন এই মাংসল

পাখিগুলোকে দেখে রামোশিয়াদের জিবের জল পড়তে থাকে। দিনরাত বন্দুক, তীর, গুলতি নিয়ে রামোশিয়াদের ছোট ছোট ছেলেগুলো মাঠ, ফসলের ক্ষেত ও মালভূমির মধ্যে গিয়ে এইসব সারসদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। এদের তাক করে মারতে গিয়ে ভুলবশত অন্য দু-চারটে পাখি মারা পড়ে। কদিন পরে দেখা যায়, রামোশিয়াদের বাড়ি থেকে মাংস রান্নার গন্ধ বার হচ্ছে।

হাজার ফুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু সংগ্রহ করে মৌমাছিরা মৌচাক বানায়। মেষপালকের বাচ্চা আর রামোশিয়াদের বাচ্চারা মধুর লোভে কুড়াল হাতে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কুড়াল দিয়ে ভেঙে মৌচাক নামিয়ে তারা মধু খায়।

আবার জোয়ার কাটার সময় এসে গেল। এসে গেল কলাই ও ছোলা কাটবার মরসুম। ফসল রাখবার জন্য খলিহাল তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সকলে মিলে খলিহালের জমি বেশ করে নিকোতে লাগল।

ফসল কাটা শেষ হল। ঢেঁকিতে জোয়ার ভানা হচ্ছে। ফসল ঝাড়া হচ্ছে। হাওয়ার চোটে ভুসি উড়তে লেগেছে। মুক্তোর মত জোয়ার জমা হতে শুরু করেছে। ফসলের ভাগ নেবার জন্য লোকের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। একদিকে ফসলের ওজন হচ্ছে। পাখি, জানোয়ার আর চোরের হাত এড়িয়ে কৃষকেরা তাদের ভাগের ফসল ঘরে তুলছে।

কলাী, ছোলা প্রভৃতি ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার পর খালি মাঠে গরীব কাঙালেরা পড়ে থাকা দানা একটি দুটি করে তুলতে শুরু করেছে। তাদের হাত থেকে পড়ে যাওয়া দানায় পাখি

আর পিপড়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারপরও যা বাকী রইল তা জমিতেই পড়ে রইল। বর্ষার জল পেয়ে সেগুলিতে আবার অঙ্কুরোদ্‌গম শুরু হল। দশমাস পরে আবার ফসলের ক্ষেত ধু ধু করতে লাগল। ফসলের মরস্থম শেষ। পাখিরা উড়ে গেছে। দরজার সামনে বসে লোকে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আরামে তামাক টানতে শুরু করেছে।

এই সময়টা গ্রামে বেশ আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। অভিনয় দেখাবার জন্য নটের দল আসে। ভালুকওয়ালা এসে ভালুক নাচ দেখায়। ম্যাজিকওয়ালা এসে হাত সাফাইর খেলা দেখায়। এইসব খেলা লোকে খুব উপভোগ করে। খুশী হয়ে কেউ এক সের, সওয়া সের আনাজ ম্যাজিকওয়ালাকে, ভালুকওয়ালাকে বা নটকে দিয়ে দেয়।

মেষপালকদের গুণী ছেলের দল একসঙ্গে মিলে গাজন নাচ নাচতে শুরু করে। ওরা কালো রঙের গেঞ্জী পরে যার মধ্যে কাঁচের টুকরো বসানো। আর সাদা রঙ দিয়ে তার ওপর ময়ূর, বলদ প্রভৃতির ছবি আঁকা। হাতে একটা করে রঙ-বেরঙের রুমাল নিয়ে সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায়, একটা বড় ঢোল নিয়ে ঢাকী 'তাক ধিনা ধিন' করে বাজাতে থাকে। করতালওয়ালা সঙ্গে সংগত করতে থাকে। লাল-সবুজ রুমাল উড়াতে উড়াতে মেষপালক ছোকরার দল এক-পা আগে-পিছনে দিয়ে গোল হয়ে নাচতে থাকে। আস্তে আস্তে নাচ আরম্ভ হয়। তারপর খুব জোরে জোরে নাচতে থাকে ছেলেরা। হাতে লাল-নীল রুমাল নাড়তে থাকে। ঢোল বেজে চলে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশজন মেষপালক আর ঢোল-করতাল বাজনদার সবাই এক হয়ে যায়।

দূর থেকে সেই নাচ দেখে মনে হয় যে নেশায় চুর হয়ে কোন এক চপল গুণী বুঝি একা একা নেচে চলেছে।

কম্বল বিছিয়ে বসে থাকা মেষপালকেরা, দরজায় দরজায় দাঁড়ানো বউরা, বাচ্চারা, সবকিছু ভুলে যায় তখন। সেই গানের ছন্দ ওদের দেহমনে অনুরণন জাগায়। নাচের ছন্দে ছন্দে দেহেও হিল্লোল জাগে। সারা বনগরওয়াড়ী নাচতে থাকে, তাক ধিনা-ধিন তাক ধিনা-ধিন।

তেরো

কিছুদিন ধরে মুখিয়াজী আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল আর সে পাঠশালায় এসে বসে না। আমার ঘরেও আসে না। আমার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করাও ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম আমার খুব খারাপ লাগত। পরে আমিও সব ভুলে গেছি। আমারও একটু অভিমান হল। আমি কোন দোষ না করা সত্ত্বেও বুড়ো আমার ওপর রেগে আছে। ওই কনফুসকেটার কান-ভাঙানি শুনে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। বুড়োর সঙ্গে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করে শেষে আমিও ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম।

পাঠশালার কাজ খুব বেড়ে গেছে। ছাত্র ভালই আসছে। তাদের পরীক্ষা নেওয়া, হাজিরার হিসাব রাখা, ক্লাসে পড়ানো

সব কিছুর ওপরেই আমাকে বেশ নজর রাখতে হচ্ছে, কেননা, শিক্ষা-বিভাগের লোকেরা আসা-যাওয়া আরম্ভ করেছে। গাঁ দেহাতে পাঠশালা খোলা হয়েছে, তার সাফল্য বা ব্যর্থতা পরীক্ষা করে দেখা দরকার— বোধহয় এই রকম একটা ধারণা থেকেই শিক্ষা-বিভাগ এত সজাগ হয়েছে। ওপর থেকে নানান রকম নির্দেশও আসছিল, নানা রকম আদেশ জারিও শুরু হল। ফসল কাটার ছুটিতে ছেলেদের বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করে নিয়মিত ভাবে পাঠশালায় একত্র করার কাজটা আয়বু, আনংদা আর রামাই করছিল। গাঁয়ের লোকেরা এখন আর আমার কথা ফেলতে পারে না। পাঠশালা ও মাস্টারের প্রতি তাদের একটা টান পড়ে গেছে।

এক সোমবার আমি পাঠশালায় গেলে বাচ্চারা শোনাল যে তৃতীয় শ্রেণীর সদা একা একটা শিয়াল মেরেছে। আমার খুব অবাক লাগল।

"কি করে মারল রে?"

"বাবলা গাছ কাটার কুড়াল দিয়ে মেরেছে মাস্টারজী। ওর ঘরের সামনেই মরা জানোয়ারটার ছাল টাঙিয়ে রেখেছে।"

"সদা কোথায়? পাঠশালায় আসে নি?"

"এখন থেকে ও আর আসবে না মাস্টারজী। ওর বাবা ওকে ভেড়া চরাবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।"

রাত্রিবেলা পাঠশালার সামনে যথারীতি মজলিশ বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সদা একটা শেয়াল মেরেছে শুনলাম, সত্যি নাকি?" মেষপালকেরা সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি।

বনগরওয়াড়ীর আশেপাশে সব সময় এই সব শিয়ালেরা ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই মোটাসোটা নাদুস নুদুস ভেড়া নিয়ে পালায়। যদি ভাল ভেড়া হয় তবে ভেড়ার মালিক পিছনে পিছনেই থাকে। শিয়ালের গ্রাস থেকে ভেড়াদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। অনেক সময় ভেড়ার কামড়ে শিয়াল মরে গেলে কসাইরা অল্প দামে চামড়া কিনে নেয়। কিন্তু কয়েকবার শিয়ালেরা ভেড়া নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মেষপালকেরা খালি হাতে ফিরে এসেছে। শিয়ালের অত্যাচার খুব বেশীরকম শুরু হলে বিশ-পঁচিশজন জোয়ান ছোকরা মিলে কুড়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কড়া রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এইসব শিকারী ছেলের দল এর ওর ক্ষেতের বাদাম, ছোলা খেয়ে নষ্ট করে খালি হাতে ঘরে ফিরে আসত। এত অত্যাচার সত্ত্বেও এইসব ধূর্ত শেয়ালদের মারার জন্য গ্রামের কেউ তেমন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করত না। এইসব জানোয়ারের মাংস মানুষের খাদ্য নয় বলে রামোশীরা শেয়াল শিকারে তেমন উৎসাহ দেখাত না। আর মেষপালকদের মধ্যে সংস্কার ছিল যে ডেরার ভেতর থেকে শিয়াল যদি কোন ভেড়া নিয়ে পালায় তাহলে ডেরার বাকী ভেড়াদের আর সংক্রামক রোগ হয় না। আর এই অবহেলায় ঐ সব জানোয়ারেরা ভয়ংকর অত্যাচারী হয়ে উঠে দিনে দুপুরে ক্ষেতে বাগানে ভেড়াদের ডেরায় হানা দিতে শুরু করল।

বিরা মেষপালকের কোন কাজে গ্রামের বাইরে যাবার দরকার হওয়ায় সে তার ছেলে সদাকে মেষ চরাতে পাঠিয়েছিল। লাঠি-কুঠার নিয়ে সদা মালভূমিতে মেষ চরাচ্ছিল। বিকেলের দিকে ক্ষেতের কাছাকাছি বসে একটি বড় শেয়াল ভেড়াদের দলের ওপর

নজর রাখছিল। আর বেশ দ্রুতপায়ে করীল গাছের ঝোপের আড়ালে আড়ালে ভেড়াদের দিকে এগুচ্ছিল। তখনও পর্যন্ত সদার নজরে কিছু আসেনি। এরপর দল থেকে পিছিয়ে পড়া মোটাসোটা এক খাসি ভেড়ার ওপর শিয়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড় দিয়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সদার সঙ্গের পাহারাদার কুকুরটা জোরে চিৎকার করে উঠল। সেই ডাক শুনে সদার ধ্যান ভাঙল। চিৎকার করে গালাগাল দিতে দিতে সদা জানোয়ারের পিছন পিছন দৌড়তে লাগল। কুকুরও দৌড়তে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে কুকুর শিয়ালের কাছে গিয়ে পেঁ ছিল। লাফিয়ে পড়ে শিয়ালের একটা পা কামড়ে ধরল। অচমকা চোট লাগায় শিয়াল মুখের গ্রাস ছেড়ে পিছন ফিরে কুকুরের মুখোমুখি দাঁড়াল। দাঁত বার করে সে কুকুরটার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করল। নিজের পা-টা ছাড়াবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু শেয়াল কিছুতেই পা ছাড়াতে পারল না। শত চেষ্টা করেও শিয়াল কুকুরটার টুঁটিতে কামড় বসাতে পারল না। দুজনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ শুরু হল। কুকুরের থেকে শিয়ালের জোর বেশী ছিল, তাই কুকুরকে সে কাবু করে ফেলল, পায়ের কামড় ছেড়ে কুকুরটা উলটে পড়ে গেল। এই সুযোগে শিয়াল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে দাঁত দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলল। এরমধ্যে সদা সেখানে এসে পড়েছে। সে কুকুরের বুকের ওপর বসা শিয়ালের দিকে কুঠার ছুঁড়ে মারল। রক্তের ফোয়ারা ছুটল। শিয়ালটা উল্টে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর প্রচণ্ড রাগে সদা তার ওপর কুঠার চালাতে লাগল।

শিয়ালও মরল। কুকুরও মরল। মাটি খুঁড়ে গর্ত করে সদা তার প্রিয় কুকুরকে সমাধি দিল। মড়া ভেড়াটাকে কাঁধের ওপর নিয়ে আর শিয়ালটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে সদা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালার সময় হয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণ মার কাছে বলতে বলতে সদা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। কুকুর হারালো। ভেড়া হারালো। সদা এইজন্যই কাঁদছিল। তার মাও কাঁদতে কাঁদতে সদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল। বলল, "কুকুর মরেছে, বাহাদুরের মত শিয়ালকে মেরে, এই উপলক্ষে আমি নাহয় ভেড়াটাকে বলি দিলাম। তুই কেন কাঁদছিস?"

এইসব ঘটনা শোনার পর আমি ভাবছিলাম সদা কবে পাঠশালায় আসবে, আর আমি ওকে বাহবা দেব। চার-পাঁচদিন হয়ে গেল তবু সে পাঠশালায় এল না। খবর পাঠিয়ে জানতে পারলাম সে আর পাঠশালায় আসবে না। সে ভেড়া চরাবার কাজে লেগে গেছে।

একদিন সময় করে সব জেনে শুনে সদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

তখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওর বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ আমার খেয়াল হল এখনই হয়তো ওর কুকুরটা দৌড়ে আসবে। তাই আমি চিৎকার করে বাইরে থেকে হাঁক দিলাম, "এই সদা"— বাড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ এল, "কে?"

"আমি মাস্টার। কুকুর সামলে রাখ। নয়তো এক্ষুনি দৌড়ে আসবে।"

সদা খুব শান্তভাবে উত্তর দিল, "কুকুর নেই মাস্টারজী।

আসুন।" এতক্ষণে আমার মনে পড়ল যে সদার কুকুরটি শেয়ালের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আমার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হল।

বাড়ির সামনে সুন্দরভাবে নিকানো উঠান, উঠানের একপাশে তুলসী গাছে পাতা ভরে আছে।

উঠানের একধারে কম্বল পেতে দিয়ে সদা আমাকে বসতে বলল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ভেড়ারা জাবনা খাচ্ছে। সদার বাবা বিড়ি টানতে টানতে ছাগলের দুধ দোয়াচ্ছে। বাইরে গোয়ালে ভেড়ারা আটকানো। গরুদের গলায় বাঁধা ঘণ্টাগুলি থেকে ঝুনঝুন আওয়াজ উঠছে।

"খুব বাহাদুরি দেখালি তুই, আমি সব শুনেছি।"

সদা বলল, "কিন্তু শিয়াল আমার কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে মাস্টারজী।"

"আমি সব শুনেছি।"

কিছুক্ষণের জন্য আমি নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। সদাও চুপ করে রইল। দুধের বালতি হাতে বিরা এসে উপস্থিত হল।

"দুধটা রইল। রাতে কি মনে করে?"

আমি বললাম, "এই বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।"

"বসুন। আমার এখানে চা-টা নেই। দুধ খাবেন?"

"না, চা-দুধের কোন দরকার নেই।"

"তা বললে কি চলে! আমার কথা রাখুন। একটু দুধ খান। খোকা, যা ভেতর থেকে একটা গেলাস নিয়ে আয় তো।"

বিরা আমার সামনেই বসে পড়ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চার-পাঁচদিন ধরে সদা পাঠশালায় যাচ্ছে না কেন?"

"আমি বারণ করে দিয়েছিলাম। ভেড়া চরাবার জন্য।"

"তা কাজ তো শেষ হয়ে গেছে। কাল থেকে আবার পাঠান।"

বিরা একটু হাসল। দুধ ভরতি গেলাসটা আমার সামনে রেখে সদাকে বলল, "যা বালতিটা ভেতরে রেখে আয়।"

খাঁটি মিষ্টি দুধ আমি তারিয়ে তারিয়ে খেতে শুরু করলাম। ছাগলের দুধ একটু গন্ধ গন্ধ লাগে। আর তা ছাড়া আমার ছাগলের দুধ খাওয়া অভ্যাসও নেই।

বিরা আবার বলল, "সদা আর পাঠশালায় যাবে না মাস্টারজী। আমিই ওকে বারণ করেছি। যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। আর দরকার নেই। এবার একটু নিজেদের জাত-ব্যবসা শিখুক।"

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পড়া ছাড়াচ্ছেন কেন? অন্তত ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়তে দিন।"

ঘাড় নেড়ে বিরা বলল, "কী করবে পড়ে? আরে ও তো এখনই বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। ওকে এখন নিজের জাত ব্যবসায়ে লাগতে দিন।"

আমি অনেক বোঝালাম। কিন্তু সদার বাপ কিছুতেই সদাকে আরও চার বছর নষ্ট করতে দিতে রাজি হল না। সে জোর দিয়ে বলল, "আমি আমার ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাব না। সদা এখন আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। তাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ। আপনি জোর করবেন না। আর পাঠশালায় যেতে সদারও ইচ্ছা নেই।"

আরও আধ ঘণ্টা বসে অনেক কথা বলার পর আমি উঠলাম। খোলা মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চলতে চলতে আমি ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

একদিন দুপুরে পাঠশালার ছুটির পর স্নান করার জন্য গ্রামের বাইরের কুয়াতে যাচ্ছিলাম। দেখি বুড়ো মুখিয়াজী আমার পিছন পিছন আসছে। দু-একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মুখিয়াজী তখনও আসছে। দুপুরের রোদে পথের ধুলো তেতে উঠেছে। বুড়োর পরনে একটা ধুতি ছাড়া কিছু নেই। সে আমার পিছু পিছু আসছে। আমি আল পথ ছেড়ে কুয়োর পথ ধরলাম। দেখি কি, অমনি বুড়োও আল পথ থেকে নেমে এল। যদি সে স্নান করতে আসত তাহলে গামছা-ঘটি নিশ্চয় নিয়ে আসত। কিন্তু বুড়োর কাছে ওসব কিছুই নেই। আমার বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। আমি কুয়োর কাছে গেলাম। তারপর কাপড় ছেড়ে লেঙ্গট পরে জলে নামলাম। একেবারে জলে গিয়ে পড়লাম। দু-চারটে ডুব দেবার পর ওপরে উঠে গা-হাত-পা রগড়াতে লাগলাম।

বুড়ো মুখিয়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভেতরে এসে আমি যে সিঁড়িতে বসেছিলাম তার দু-এক ধাপ ওপরে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, "এক গাঁয়ে বাস করে একজনের সঙ্গে আর-একজনের কথা না বলাটা ঠিক নয় মাস্টার।'

বুড়োকে নিজের মুখে এ কথা বলতে দেখে আমি খুব আশ্চর্য হলাম। বললাম, "কথা বলা আপনিই বন্ধ করেছেন বাবা, আমি নয়।"

"কিন্তু কেন বলি না, কী জন্য বলি না, এ কথা কোনদিন তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছ?"

"কেন জিজ্ঞাসা করব?"

"কেন তাতে কি তোমার অপমান হত? আরে তুমি কালকের ছোকরা, আমাদের মত বুড়োদের সঙ্গে মান সম্মানের প্রশ্ন তুলছ?"

বুড়োর কথায় আমার হাসি পেল। আমার গায়ে পড়ে সেসব কথা তুলতে ইচ্ছা হল না। কেন যে আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি না, এ কথা যদি সে কোনদিন আমাকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করত আমি বলে দিতাম। কিন্তু বুড়ো নিজেই বলল, "কনফুসকা আমাকে বলেছে যে তুমি আমার নাতনি অঞ্জীকে চোলী দিয়েছ। কী এ কথা সত্যি ?"

আমার মুখ পাংশু হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। কী যে জবাব দেব তাই ভেবে পেলাম না। বুড়ো যে এজন্যই আমার সঙ্গে কথা বলে না, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। অঞ্জীকে যে চোলী এনে দিয়েছিলাম সে কথা আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে থেকে বুড়ো আবার বলল, "কনফুসকে হনুমানজীর পা ছুঁয়ে শপথ করে বলেছে, সে দেখেছে, তুমি চোলী দিচ্ছ আর অঞ্জী হাসতে হাসতে হাত পেতে সেটা নিচ্ছে। এই ঘটনা জানতে পেরে আমার তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। মেয়েটাকে বেধড়ক পিটিয়েছি আর তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। সেদিন থেকেই তোমাকে নজরে নজরে রেখেছি। কিন্তু কখনও তোমার বেচাল কিছু দেখিনি। তাই তোম'র কাছে এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে এর একটা ফয়সালা করে নিতে চাই।"

"মিথ্যে কথা, একদম মিথ্যে কথা, কনফুসকা পাজী লোক। আপনার সঙ্গে আমার এত ভাল সম্পর্ক দেখে ও হিংসায় জ্বলে-পুড়ে আমার নামে এইসব মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে আপনার কাছ থেকে আমায় দূরে রাখতে চায়।"

আমার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল। বুক ধড়ফড় করছিল। বুড়ো বলল, "তাহলে বলতে চাও এই চোলী দেবার খবর মিথ্যা?"

"আমিই চোলী দিয়েছি। কিন্তু বিনা পয়সায় নয়। অঞ্জী আমাকে কাপড় দিয়ে সদর মহকুমার দর্জিকে দিয়ে বানিয়ে আনতে বলেছিল। আমি আপনাকে বলিনি তার কারণ অঞ্জীই বলতে বারণ করে দিয়েছিল। বলেছিল, সে লুকিয়ে এটা বানাতে দিচ্ছে, আমি যেন আপনাকে না বলি। বিশ্বাস না হয় ওকে আমার সামনে ডাকুন। আমি এত পাজী লোক নই যে কেউ কিছু উপকার করে দিতে বললে চুপচাপ করে করে দিয়ে থাকি। কিন্তু সেসব উপকারের প্রতিদান যে আপনারা এভাবে দেবেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার আর কোন কথার দরকার নেই। শুধু পাঠশালার কাজ করেই আমি থাকতে পারব। বাচ্চাদের দু-চারটে আঁক কষা শেখাতে পারলেই আমার চলে যাবে।"

কথাগুলো রেগেমেগে এমন তাড়াতাড়ি করে বললাম যে বুড়ো বেশ ঘাবড়ে গেল। "দেখ, আমার কিন্তু সত্যিই মনে হয়েছিল যে তুমিই অঞ্জীকে চোলী দিয়েছিলে। তাই আমি তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বন্ধ করে ছিলাম। আজ যখন তুমি নিজেই সব কথা খুলে বললে তখন আমি ওসব কথাকে মিথ্যে ভাবছি। কনফুসকা প্রথম থেকেই তোমার ভাল চাইত না। তা তোমার মনে কোন পাপ নেই-তো?"

আমি তখনও রেগে ছিলাম। বুড়ো আমাকে আর-একটু বাজিয়ে দেখতে চায়। ওর কথাবার্তায়, ওর মুখের অভিব্যক্তিতে এই মনোভাব ফুটে উঠেছিল।

"হঁা, আরও জিজ্ঞাসা করুন, পাপ কাকে বলে? ভাল লোকের পক্ষে আপনাদের এই গ্রামে থাকাও পাপ। আপনারা ভাল-মানুষদেরও বোকা বানিয়ে দেবেন। ব্যস, খুব হয়েছে। এখানে চাকরি করা আমার আর দরকার নেই। আমি দরখাস্ত পাঠিয়ে অন্য গাঁয়ে বদলি হবার চেষ্টা করছি।"

এই কথা বলে আমি কুয়োতলা থেকে ওপরে উঠে এলাম। কাপড় ছেড়ে বাড়ির পথ ধরলাম। বুড়ো ওখানে কতক্ষণ বসে ছিল, কখনই বা উঠে বাড়ি গিয়েছিল তা আমি কিছুই জানি না।

আমার খালি মনে হতে লাগল ব্যাটাকে ধরে এনে গাঁয়ের সবার সামনে পেটাই।

কিন্তু আমার মত এত রোগা লোকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। ওর বিরুদ্ধে কোন মামলা ঠুকে যে জেলে পাঠাই বা কোন জানাশোনা দারোগাকে দিয়ে ধোলাই খাওয়াই তাও এমন কোন দারোগার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। সারাদিন আমার মাথার মধ্যে শুধু এই চিন্তা ঘুরতে লাগল।

আমার এই মানসিক অবস্থার কথা আয়বু জেনে গিয়েছিল। কিন্তু কী হয়েছে তা সে জানত না। আমাকে এর কারণও জিজ্ঞাসা করেনি।

আমি রাতে শোবার সময় আয়বুকে বললাম, "কনফুসকা আমার খুব ক্ষতি করেছে।"

আয়বু বলল, "মাস্টারজী, ওকে একবার উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়ে দিন।"

"উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেওয়াটা কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু গ্রামের সবাই কী ভাববে। আজ পর্যন্ত গ্রামের কেউ আমাকে একটাও

খারাপ কথা বলেনি, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এখন ?"

আমার কথা শুনে আয়বু ভাবল মারামারি করা ঠিক হবে কিনা। একটু বুঝিয়ে বললেই আয়বু সব বুঝে ফেলত। অন্তত তার মুখ দেখে মনে হত সে বুঝতে পেরেছে।

"আজ কনফুসকে আপনাকে কী করেছে মাস্টারজী ?"

"এর কথা তাকে, তার কথা একে ছাড়া আর কীই বা বলবে ? মুখিয়াজী আমার সঙ্গে কথা বলত না তার কারণ কনফুসকে।"

"সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি।"

"মাস্টারের সঙ্গে অঞ্জীর সম্পর্ক যে সন্দেহজনক একথা কনফুসকে বুড়োকে বলেছে।"

এই অস্বাভাবিক বাজে খবর শুনে আয়বু কনফুসকের বিরুদ্ধে গালাগাল শুরু করল। ওর ধারণা কনফুসকে রঙ চড়িয়ে আরও অনেক মিথ্যে কথা মাস্টারের বিরুদ্ধে বলেছে। সে বলল, "কনফুসকা যে এতদূর যাবে তা কিন্তু ভাবতে পারিনি।"

আমি বললাম, "গাঁয়ে আমার খারাপ কেউ চায় না। কিন্তু কনফুসকা প্রথম থেকেই কালসাপের মত আমাকে কামড়াতে চাইছে। আমি যে কী করব ঠিক করে উঠতে পারছি না। তা ছাড়া ও আমার সামনে আসতে চায় না। কিন্তু পেছন থেকে আমায় গালি গালাজ করে।"

কথা বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, এই ঘরে বসেই ও কী রকম করে শাসিয়ে গিয়েছিল। হয়তো অঞ্জীর ব্যাপারটা নিয়ে গাঁয়ের সবাইকে তাতিয়ে দিয়ে ও আমাকে মার খাওয়াবে। এসব কথা

ভেবে ভেবে অনেকক্ষণ আমার ঘুম হল না। আয়বু কিন্তু দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল।

এর তিন-চার দিন পর চৌপালের সামনে অনেকক্ষণ বসে আমি ঘরে ফিরলাম। আয়বু ঘরে শুয়েছিল। তেল ঢেলে, প্রদীপে আলো ধরিয়ে বিছানা করে আমি শুয়ে পড়লাম।

তন্দ্রা আসতে না আসতেই কোনকিছুর গোলমালের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলাম না। পরে মনে হল বাইরের মাঠে গণ্ডগোল হচ্ছে। অন্ধকারে উঠে বসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সোরগোল ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মনে করলাম হয়তো শেয়াল এসেছে নয়তো সাপ বেরিয়েছে।

আয়বুকে কিন্তু চট করে জাগানো গেল না। অন্ধকারের মধ্যে ওর গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে জাগানো হল। ও ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? একটু আচ্ছন্ন ভাবটা কাটলে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটা গোলমাল কানে আসছে? চৌরাস্তার সামনে লোক জড়ো হয়েছে।

সে কান পেতে শুনল।

"মনে হচ্ছে ওখানে কোন গণ্ডগোল হচ্ছে। গিয়ে দেখে আসব?"

আমি বললাম, "চল, আমিও যাচ্ছি।"

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমরা কোনরকমে গিয়ে পৌঁছলাম। যাকে সামনে পেলাম তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে? গোলমাল কেন?

লোকটি বলল, "দাদু কনফুসকাকে কে যেন খুব মেরেছে।"

"কে মেরেছে?"

"অন্ধকারে কাউকে দেখা যায়নি।"

ভিড় ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম, প্রদীপ জ্বালিয়ে এক বুড়ি বসে আছে। "ও মা, কী হবে গো!" বলে বুড়ি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। দাদু কনফুসকা ধুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে। তার পাগড়ি একদিকে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। জামা ছিঁড়ে গেছে, রামা আর মুখিয়াজী কনফুসকার পায়ের কাছে বসে। তারা দুজনে বার বার বলছে, "ও দাদু, উঠে বোস। বল দেখি, কী হয়েছে? কে মারল তোমায়?"

কনফুসকা চোখ বন্ধ করে খালি ঘাড় নাড়ছে। সে না পারছে উঠে বসতে, না পারছে কথা বলতে।

আমি বললাম, "একে এই ধুলোর মধ্যে কেন ফেলে রেখেছেন? উঠিয়ে নিয়ে যান।"

সবাই আমার কথায় সায় দিল। কিন্তু কেউই এগিয়ে গিয়ে ওকে তোলার চেষ্টা করল না। শেষে আনংদা যোশী এসে মরা ছাগল যেমন পাঁজা কোলা করে তোলে তেমনি করে তুলে দাদুকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলল।

পনেরো-বিশজনের এক জনতা দল বেঁধে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে করতে আর একে অন্যকে ব্যাপারটা বোঝাতে বোঝাতে পেছু পেছু চলল।

দাদুকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে মাটিতে বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া হল। ওর বুড়ি কেঁদেই চলেছে দেখে, বুড়ো মুখিয়াজী রেগে গিয়ে বলল, তুমি চুপ কর সুন্দ্রা, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কাঁদছ কেন? ও কি মরে গেছে যে এমন করে চোখের জল ফেলছ?

ঘরে লোকের ভিড়। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দাছুর একটু হুঁশ হল। সে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আমাকে চিনতে পারছেন?" সে কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে মুখিয়াজী বলল, "দাছু আমাকে চিনতে পারছ? আমি কে বল তো?"

দাছু তখন হাত বার করে বুড়োর হাত নিজের হাতে নিয়ে জোরে চেপে ধরল।

"ভয় নেই, তোমার কিছু হবে না, আমরা আছি।" এ কথা বলে বুড়ো ওর হাত পা টিপে দিতে লাগল। একজন বলল, "হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন চিৎকার করছে, 'মরে গেলাম— মরে গেলাম, আমাকে মেরে ফেলল রে।' আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু আগে গিয়ে দেখি কে একজন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে? তুমি কে?' তখন ও বলল, 'আমি দাছু— আমাকে মেরেছে'।"

এই কথা শুনে রামা বলে উঠল, "কে মেরেছে, কেন মেরেছে খোলশা করে বললেই তো মিটে যায়।"

সেই লোকটি আবার বলল, "ভগবান জানেন, কেন মেরেছে, কে মেরেছে? দাছু কিছুই বলেনি, আমি জানব কেমন করে?"

"তুমি কাউকে পালাতে বা লুকতে দেখনি?",

"না মশাই, মায়ের নাম করে বলছি কাউকে দেখিনি। মিথ্যে কেন বলতে যাব।"

"তবে কে বলতে পারে দাছুকে কে মেরেছে?"

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এ কি ভানুমতীর খেল নাকি!"

"আরে কেউ দৌড়ে গিয়ে পাশের গ্রাম থেকে ওঝা ডেকে নিয়ে এস-না। ও বেশ ভাল মন্ত্র জানে। এক্ষুনি ভাল হয়ে উঠবে।"

কিন্তু দেখা গেল, কেউ যেতে রাজি নয়। এ বলে তুই যা, ও বলে তুই যা। তখন আমি চিৎকার করে বললাম, "ভানুমতী টানুমতী কিছুই না, দাদুকে একটু দম নিতে দিন, তবেই সব জানা যাবে।"

কিন্তু ভোর হবার মুরগীর ডাক শোনা গেল, তবুও কনফুসকা বসতেও পারল না, কথাও বলতে পারল না। সবাই চলে গেছে, কেবল আমি আয়বু, মুখিয়াজী, রামা আর গ্রামের দু-চারজন বসে আছি। ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে দাদু চোখ খুলে জল চাইল। গরম গরম চা দেবার পর সে দেহে একটু বল পেল।

রামা বলল, "এখন একটু ভাল লাগছে দাদু?"

কনফুসকা চিঁ চিঁ শব্দে করে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমাকে কে মেরেছে?"

একটু দম নিয়ে সে বলল, "তাকে আমি চিনতে পারিনি।"

"কতজন ছিল ওরা?"

"কিছুই জানি না। অন্ধকারের ভেতর সারা শরীর কম্বলে মুড়ি দিয়ে তারা এসেছিল। আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে লাঠি দিয়ে দমাদম পিটিয়েছে। জানোয়ারের মত মেরেছে আমাকে রামা বদমায়েশগুলো।"

"তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?"

কনফুসকা অস্বীকারের ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে আমার দিকে তাকাল।

ভোরের আলো কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠে গেছে। "আচ্ছা, আরাম কর' বলে মুখিয়াজী এবার উঠল। আমিও উঠলাম। বাইরে এলাম।

রামা বলল, "এই দালালটার তো হাজার শত্রু। অন্য গাঁয়ের কেউ এসে মেরে গেলে আর কী করে জানা যাবে?"

আয়বু বলল, "দাদু বলছে না বটে। কিন্তু কে তাকে মেরেছে সে তা ভাল করেই জানে।"

মুখিয়াজী বলল, "তা হতে পারে। চোরের খবর চোরই রাখে। ভাগ্যি ভাল যে ঘা-কতকের ওপর দিয়েই গেছে। প্রাণে মেরে ফেললে কীই বা করার ছিল।"

বাড়ি ফিরে আমি আয়বুকে বললাম, "আচ্ছা আয়বু, দাদুর সঙ্গে তো আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। কাল যদি সে আমাকেই সন্দেহ ক'রে বসে?"

আয়বু চিৎকার করে বলল, "ওই হিজড়েটা আর কী করবে? তার ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে। ও এখন ছ মাস বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।"

আর সত্যিই তাই হল।

আট-পনেরো দিন কেটে যাবার পরও কুনফুসকা চলাফেরা করতে পারল না। তাড়াতাড়ি যে সেরে উঠতে পারবে তারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দিনরাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে চিৎকার করে। কেউ গেলে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। এসব দেখেশুনে গাঁয়ের লোক বলতে লাগল, "দাদুকে ভূতে ধরেছে। ও আর বাঁচবে না।"

চৌদ্দ

একবার আমার মনে হল এ গ্রামে দু-একটা পাকা দালান বাড়ি থাকলে ভাল হত। তা হতেও পারে। কিন্তু গাঁয়ের লোকের টাকায় তা বানাতে হবে। এত খরচ করতে এই পাগল মেষপালকেরা কি রাজি হবে?

গাঁয়ে যে পাকা বাড়ি হবে একথা ওরা ভাবতেও পারে না। পাঠশালা তৈরি করার জন্য তো অনেক জায়গা পড়ে আছে। আর অদূর ভবিষ্যতে তা বানাবার কোন সম্ভাবনাও নেই। তবে আবার পাকা বাড়ির চিন্তা কেন? তবে তার থেকে একটি আখড়া তৈরি করা অনেক ভাল। বাচ্চাদের খেলবার জন্য, সুযোগ এলে গাঁয়ের লোকদের একজায়গায় বসে কথাবার্তা বলার জন্য একটা লম্বা চওড়া আখড়া বানানো অনেক ভাল। শরীর চর্চার প্রতি রাজধানীর রাজা সাহেবের যথেষ্ট আগ্রহ আছে এই কারণে শিক্ষা বিভাগ থেকে, সরকার থেকে কিছু সাহায্যও পাওয়া যাবে। এই গ্রামে আমি পাঠশালার মাস্টার ছিলাম, একথাও সবার মনে থাকবে।

রাত্রিবেলা আমি সারা গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি রামোশীকে পাঠিয়ে লোকজন একত্র জড়ো করলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে সবাই কম্বল গায়ে জড়িয়ে পাঠশালার সামনে এসে জমায়েত হল। ঢিবির

ওপরে সবাই বসল। মুখিয়াজী, শেকু, রামা, তাতুক, আরও অনেকে এসেছে। এখন ক্ষেতের কোন কাজকর্ম নেই বলে সবাই বেশ আগ্রহ করেই এসেছে।

প্রথমে সবাই এর ওর খবরাখবর নিল। জানা গেল কনফুসকার অবস্থা আগের মতই আছে। সারা শরীর ব্যথা। কে যেন ফৌজদারি মামলা করার পরামর্শ দিয়েছিল। তাতে দাছু বলেছে, ধর ফৌজদারি করলাম, বা কে মেরেছে জানাও গেল, কিন্তু তাতে আমার শরীরের যন্ত্রণা তো কমবে না।

"কথাটা সত্যি।"

সবাই একটু শান্ত হলে আমি আমার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। বললাম, "গাঁয়ে একটা পাকা ঘর বানাব, ধানের গোলা, ঝোপড়ি, মাটির ঘর এসবের থেকে ভাল মজবুত একটা বড় ঘর।

"রোজ আমরা সবাই এই মাঠের মধ্যে ধুলোর ওপর বসি, বর্ষা হলে, ঠাণ্ডা পড়লে কেউই আসে না, বসে না। শিক্ষা-বিভাগ থেকে অফিসাররা এলে, থানার দারোগাবাবু বা সিপাই এলে আরও অসুবিধা হয়। তাদের বসতে দেবার মত কোন জায়গা নেই। ভাঙ্গী-চামারদের গ্রামেও দু-একটা পাকা বাড়ি থাকে, তবে আমাদের এই গ্রামে থাকবে না কেন? তাই আমি ভেবেছি যে আমাদের এখানে একটা আখড়া তৈরি করব। আপনাদের সবার কী মত?"

লোকদের মধ্যে ফিসফিস আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ওদের মনে হল মাস্টার বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, "নিজেদের মধ্যে কথা বলবেন না। যা বলার আমাকে বলুন।"

বালা মেষপালক চিবোতে চিবোতে বলল, "গাঁয়ে পালোয়ান কোথায় যে আখড়া বানাবে?"

"পাঠশালা শুরু করার সময়ও বলেছিলেন, পাঠশালায় পড়বে এমন বাচ্চা কোথায়? আর এখন বাচ্চা কি আসছে না? পাঁচ-দশটা ছেলে সদর ইস্কুলে পড়তে যাবে। ক্লাস সেভেনের পরীক্ষায় পাস করবে।"

কে একজন বলে উঠল, "কোথা থেকে আর পাস করবে? একটু বড় হলেই তো মাঠে ভেড়া চরাতে যাবে। সাতক্লাস পর্যন্ত পড়ে আপনার মত মাস্টার কেউ হবে না। আমাদের মধ্যে পাস করে কেউ কি মহকুমার অফিসার হয়েছে?"

বুড়ো মুখিয়াজী শান্ত হয়ে বলল, "আরে আজ হয়তো পালোয়ান কেউ নেই, তবে খেলতে খেলতে দু-একজন ঠিক পালোয়ান বনে যাবে।"

আমি বললাম, "আর মনে করুন, পালোয়ান কেউ নাইবা হল তবুও বাচ্চারা এখানে খেলবে। আপনারা সবাই গাজন নাচেন। সেই নাচের বাজনা, নানান জায়গায় ছড়ানো থাকে। ঢোল এক জায়গায়, করতাল এক জায়গায়। লেজিম, লাঠি, পটা নিয়ে বাচ্চারা খেলে। এইসব জিনিসপত্র ঠিকমত রেখে দেওয়ার জন্য একটা ঘরের মত আখড়া তৈরি করলে তার ভেতর থাকতে পারে। আর যে ভাল নাচ জানে, কসরৎ জানে সে অবসর সময় ছোট ছোট বাচ্চাদের এসব শেখাতে পারে— কী, কথাটা কি আমি খারাপ বলেছি?"

"কিন্তু আখড়া বানাতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। সে টাকা কে দেবে?"

"কেন, গাঁয়ের লোক দেবে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে দশ বিশ টাকা করে দিলেই তো হয়ে যায়।"

"হুঁ, এত টাকা কার আছে?"

"অনেকেরই আছে। আমি জানি। যার পয়সা নেই, সে গায়ে গতরে খেটে সাহায্য করবে। কেউ তার গরুর গাড়ি দেবে। কেউ তার গাছ দেবে। এরকম যদি গ্রামের সবাই প্রত্যেকে কিছু কিছু করে দেয় তবে একটা ভাল ইমারত তৈরি হয়ে যেতে পারে।"

কিন্তু আমার এ কথা তাদের মনঃপূত হল না। তারা বলতে লাগল, বাড়ি অর্ধেক হয়ে পড়ে থাকবে। শুধু শুধু একটা হাসির খোরাক হবে। আমিও চুপ করে রইলাম না। নানাভাবে তাদের একথা বোঝাতে লাগলাম।

গাঁয়ের সব বুড়ো আর বড়দের আবার একত্র করে তাদের বোঝালাম। বললাম, কোন্ গ্রাম কীভাবে পাঠশালা বানিয়েছে, কেমন করে সে গাঁয়ের লোক সরকার থেকে সাহায্য পেয়েছে, সে গ্রামের কত নাম, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান হয়েছে। এতসব বোঝাবার পর তাদের থেকে আখড়া তৈরির অনুমতি আদায় করলাম। যখন বুড়োরা রাজি হল তখন সাধারণ ভাবেই গ্রামের অন্যান্যরা রাজি হয়ে গেল। একজন হ্যাঁ করলে দেখাদেখি সবাই হ্যাঁ করবে। বাড়ি পিছু দশটাকা করে দিতে সবাই স্বীকার করল। কেউ বলল, গরু দেবে। কেউ বলল, গাড়ি দেবে, কেউ গায়ে গতরে খেটে দিতে রাজি হল। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে এই আখড়া তৈরি হয়ে যাবে এবং স্বয়ং রাজা সাহেব তার দ্বারোদ্ঘাটন করবেন এটাই পাকা হয়ে গেল। মাস্টারের দৌলতে আর

গাঁয়ের সকলের সহযোগিতার ফলে যে রাজা কোনদিন এ গ্রামে আসেননি, সেই রাজা যে এই মেষপালকদের গ্রামে আসবেন তা তারা কোনদিন কল্পনাই করতে পারেনি।

রাজা যে এই মেষপালকদের গ্রামে আসবেন একথা সারা গ্রামে রটে গেল। সকলের মধ্যে উৎসাহের বন্যা বহে গেল। সবার মধ্যে কাজের সাড়া পড়ে গেল। সবাই নিজেদের চাঁদা মুখিয়াজীর কাছে জমা রাখল। আমি সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আর্জি পাঠিয়ে দিলাম। রাজমিস্ত্রী আর ছুতোর মিস্ত্রী খোঁজার ধুম পড়ে গেল। সেই সব লোকেদের বেশী মজুরী দিয়ে নিয়ে আসতে হল, কারণ গ্রামে মিস্ত্রী নেই।

কাঠেরও দরকার। ঠিক ছিল দূরের পাহাড় থেকে পাথর আনা হবে। আগে কুলি ঠিক করা হোক। গাড়ি জোগাড় করে সেই সব পাথর গাঁয়ে আনতে হবে। তারপর রাজমিস্ত্রী সেই পাথর ভাঙবে। একটা প্রবাদ আছে, "ঘর তৈরি করতে হাত দাও, বুঝবে মজা।" প্রবাদটা সত্যি। গ্রামে অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্য পর্যন্ত কাজ আটকে থাকে। মোটামুটি জিনিসপত্র সব ঠিক হবার পর কোথায় আখড়া তৈরি করা হবে তা খোঁজা আরম্ভ হল। আমার ধারণা, এত জায়গা পড়ে আছে, কোথাও-না-কোথাও জায়গা পাওয়া যাবেই। কিন্তু যখন খোঁজার জন্য বেরলাম, তখন আখড়া তৈরির মত উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেল না। পরে সবার সুবিধামত একটা জায়গা পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে একটা পোড়ো বাড়ি রয়েছে। বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। মনে মনে জায়গাটি নির্বাচিত করে রাত্রিতে সে-কথা সবাইকে বললাম।

মুখিয়াজী বলল, "কিন্তু এই জমি আর বাড়িটা তো অন্যলোকের।"

"কার ?"

"অন্য গ্রামের এক বেনিয়ার ঘর। সে ওখানে ওই ঘর বানিয়ে থাকত।"

"সে এখন কোথায় ? না-হয় তার কাছ থেকে জায়গাটা কিনে নেব ?"

আমার এ-কথা শুনে সবাই হেসে উঠল ! একজন বলল, "বেনে মরে গেছে। চা আর বিড়ির জন্য তার বংশই লোপ পেয়েছে।"

লোকেরা তখন ঐ বাড়ির মালিকের ইতিহাস আমায় শোনালে। সত্যি, সদ্দা বেনে অত্যধিক চা ও বিড়ির নেশার জন্যই অকালে মারা গেছে। মদ খাওয়ার জন্য, মেয়েমানুষের জন্য, জুয়া খেলার জন্য অনেকের ঘরবাড়ি শেষ হবার উদাহরণ আছে। কিন্তু চা, বিড়ির মত অতি সাধারণ জিনিসের প্রতি নেশার ফলে সে মরে গেছে, তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এটা সত্যিই অবাক কাণ্ড। লোকে তখন বলতে লাগল, সদ্দা কখনও খাবার খেত না। সব সময় কড়া চা, আর বিড়ি খেত। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর বিড়ি ধরাত। হয়তো মাঝে মাঝে একলা বসে খেতে ভালো লাগত না, তাই কখনও কখনও সবাইকে ডেকে পাঠাত। সবাই এলে হাঁড়ি করে চা তৈরি হত। তাদের সামনে চা আর বিড়ির বাণ্ডিল ফেলে দিত।

লোকের আর কি যায় আসে, বিনা পয়সায় তারাও চা বিড়ি খেত। সদ্দা ডাকলেই ওরা আসত। চা-বিড়ি খেয়ে ফেরবার সময় বলতে বলতে যেত লোকটা একদিন ভিখারি হবে এই চা-বিড়ির জন্য।

সদ্দার কিন্তু এতে কিছুই মনে লাগত না। ও দানবীর সেজে

বসে থাকত। এরকমভাবে একবছর কেটে গেল। এক এক করে বাপ-দাদার গচ্ছিত টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল। তারপর ওর সুন্দরী বুধী গাইটাকে বেচে দিল। জমি বেচে দিল। আস্তে আস্তে সব কিছু বেচে শুধু চা আর বিড়ি খেতে লাগল। পরে বেচার মত কিছু রইল না। এককালের নামী পালোয়ান ও স্বাস্থ্যবান বেনিয়াটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে গেল। ধোঁয়ায় বুকের পাঁজরা ঝাঁজরা হয়ে গেল। চায়ের জন্য তেষ্টায় ও মরে গেল, বুড়ি তো আগেই গিয়েছিল। খেটে খাবার শক্তি আর ওর দেহে ছিল না। ঘরের সামনে সারাক্ষণ বসে থাকত আর জানাশোনা কাউকে দেখলে ডেকে ডেকে বিড়ি চেয়ে খেত। গাঁয়ের লোক দয়া করে ওকে গুড়ের চা খাওয়াত মাঝে মাঝে। এমনিভাবে কিছুদিন বেঁচে থাকার পর সে একদিন ঘেয়ো কুকুরের মত মরে গেল।

আমি সব শুনে বললাম, "মনে হচ্ছে এই বাড়ির এখন আর কোন ওয়ারিশ নেই। আখড়ার জন্য যদি এ জায়গাটা নেওয়া হয় তাহলে কোন অন্যায় হবে না।"

কিন্তু এ কথার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিছুতেই গ্রামের লোক ওই বেনের। সম্পত্তি নিতে রাজি হল না। আমি ওদের বললাম, বাড়িটা ভেঙে ফেলে জমিটা সমান করতে হবে। কেউ আমার কথায় কান দিল না। অন্য উপায় না দেখে আমি একদিন পাঠশালার বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে ঐ জায়গায় গেলাম আর বাড়ির পাঁচিল ভাঙতে শুরু করে দিলাম। বানর সেনারা কাজে লেগে পড়ল। কোদাল, শাবল লাঠি নিয়ে সবাই সেই বেনিয়ার ভুতুড়ে বাড়িটি ভাঙতে শুরু করল। মাস্টার প্রথম কোদাল হাতে বাড়ি

ভাঙা শুরু করতেই গ্রামের লোকেরা এসে গেল। প্রথম কোদাল চালাবার ফলে সমস্ত পাপ আমার ওপরেই এসে পড়ল। আর কারও কোন পাপের ভয় রইল না। গ্রামের সবাই একসঙ্গে হাত লাগাবার ফলে বাড়িটা পুরো ভাঙা হয়ে গেল। চার-পাঁচদিন পরে ওখানে বেনিয়ার ঘরের চিহ্নই পাওয়া গেল না।

এরপর গাছ জোগাড় করার জন্য মহড়া শুরু হয়ে গেল। গাঁয়ের দায়িত্বশীল লোকদের সঙ্গে নিয়ে আমি বাগানে বাগানে ঘুরতে লাগলাম। যার যার বাগানে ইমারত বানাবার উপযুক্ত নিমগাছ ছিল তারা প্রথমে একটু খিচ খিচ করে আমার অনুরোধে তা দিয়ে দিল।

এর মধ্যে কোন কোন গাছের মালিক আবার এমন সব গাছ দিতে চাইত যেগুলো ভালো নয়, ভেতরটা ফাঁপা— এ নিয়ে তাদের সঙ্গে হুজ্জোতি করতে হত। তাদের এই হীন ব্যবহার দেখে আমার ভেতরটা জ্বলে যেত। আমি তো নিজের জন্য কাঠ চাইছি না। তবে খুশী মনে দেওয়ার লোকও যে পাওয়া যায়নি তা নয়। তবে বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। কেউ গাছ দিলেই হল না, লোক নিয়ে গিয়ে গাছ কাটতে হ'ত। গাছপালা কাটার পর সেগুলি আবার একজায়গায় করা, গাড়ি জোগাড় করা, সব জিনিসপত্র নিয়ে পাঠশালার সামনে জড় করা, সেগুলি আবার মিস্ত্রীদের দেওয়া, কোন্ কাজ কে করবে, কাকে কোথায় পাঠাব, কোথায় ঘর বানাব সমস্ত জিনিসপত্রের ব্যবস্থা, সবই আমাকে করতে হ'ত।

এসব ব্যবস্থা করতে করতে যখন আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত, তখন আমি মুখিয়াজীকে বলতাম, "আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে

যাই। আপনাদের ঘর আপনারা বানান। আপনাদের যদি আখড়ার দরকার না থাকে, বা ইচ্ছে না থাকে, তবে আমি মিছিমিছি নিজের শরীর নষ্ট করে মরি কেন?"

মুখিয়াজী আমাকে বোঝাত, "আরে বাবা, তুমি চলে গেলে আর ইমারত তৈরি করে কী হবে? এত দৌড় ঝাঁপ করা হল, নিশ্চয়ই এ কাজ সফল হবে। গাছও আসবে, পাথরও আসবে, লোকজনও কাজ করবে। তুমি বৃথা চিন্তা কোরো না। আর ঘর বানানো সোজা কথা নয়, কষ্ট হবেই। দশজনের কাজ না মেথরের কাজ! এখন যে কাজে হাত দিয়েছ শেষ করে ফেলো।"

কিন্তু আমি তো কাজ মাঝপথে শেষ করতে চাইনি। তা সম্ভবও ছিল না। এখন ইমারত বানানো মানে আমার সফলতা. অসফলতার প্রশ্ন। বনগরওয়াড়ীর সম্মানের প্রশ্ন। আশেপাশের গ্রামের লোক বনগরওয়াড়ীর এই কাজের ওপর কৌতূহলী নজর রেখেছে। বোকাসোকা মেষপালকেরা আবার এ-কাজ করবে, তা হলেই হয়েছে! মাস্টার না-হয় খুব উৎসাহী লোক কিন্তু শুধু উৎসাহ দিয়ে কি হবে? আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ওদের একবার দেখিয়ে দিতে হবে। বনগরওয়াড়ীতে এমন একটা আখড়া তৈরি হবে যে আশেপাশে দশ-পাঁচটা গ্রামে তেমন আখড়া নেই।

গাছ সংগ্রহের ব্যাপারে একবার বালা মেষপালকের কাছে গেলাম। সঙ্গে ছিল আয়বু আর আনংদা। আসল উদ্দেশ্য বালার বাড়িতে খুব ভাল আর শক্ত একটা গাছ ছিল। সেই গাছে ঘরের খুঁটি খুব ভাল হবে। আনংদা রাস্তায় যেতে যেতে বাবলা গাছে বসা হেলে পাখি গুলতি দিয়ে মারছিল আর আয়বু সেগুলিকে কুড়িয়ে আনছিল। আনার সময় তাদের ঘাড়টা মটকে দিচ্ছিল।

আনংদা আবার গাছে গাছে পাখির সন্ধান করছিল আর আয়বু যেতে যেতে একটার পর একটা মরা পাখি জড় করছিল।

আমি ওদের থেকে একটু আগে আগে একা একা হাঁটছিলাম। তখন দুপুর তিনটে হবে। বালা তার বাগানে ঐ নিমগাছের তলায় বসে গরুর পুরনো দড়ি জোড়া লাগাচ্ছিল। সে নিমগাছের ছায়ায় বসেছিল। পরনে একফালি ধুতি ছাড়া আর অঙ্গে কিছু নেই। ছোট্ট মাথা, ফোলা নাক আর বিরাট বুকের ছাতি। বসে বসে একমনে সে গরুর দড়ি পাকিয়ে চলছিল।

আমি যে কেন এসেছি, তা সে বুঝে গেল। এজন্য সে আমাকে স্বাগত জানাল না, বসতে পর্যন্ত বলল না। কিছু একটা বলতেই হয়, এজন্য সে বলল, "আজ আবার কার ওপর হামলা চালাবে মাস্টার?" আমি হেসে বললাম, "আপনার কাছেই এসেছি।" বালা কথার উত্তর না দিয়ে মাটি পরিষ্কার করতে লাগল। আমি আবার সাহসে ভর করে বললাম, "তা আমাদের আখড়ার জন্য গাছটা কবে দেবেন?"

মাথা নেড়ে সে বলল, "গাছ পাবে না।"

"কেন?"

"আমার খুশী।"

"তা বললে কি হয়?"

"দেখা যাক হয় কিনা। যার হিম্মত আছে সে যেন এ গাছ কাটতে আসে।"

"জোর করে নেবার কোন প্রশ্নই আসছে না। এ তো খুশী হয়ে দেবার জিনিস।"

"কিন্তু আমি খুশী নই। আমার গ্রামের কাউকে চাই না,

আখড়াও চাই না। ছায়ার জন্য একটা গাছই আছে আমার। আমার গরু, ভেড়া বাচ্চারা সব এই ছায়ার নিচে দুদণ্ড এসে বসে, সেটুকু আপনি নিয়ে যেতে চান? আমি কিছুতেই তা হতে দেব না। গাছে কুড়ুল চালাবার আগে আপনি আমার গলাটা কেটে ফেলুন; তারপর গাছ কাটুন।"

"ঠিক আছে।" এ-কথা বলে আমি বাড়ির পথ ধরলাম। পথে আয়বু আর আনংদার সঙ্গে দেখা হল।

"মাস্টারমশাই, বালার গাছ পাওয়া গেছে?"

বললাম, "না, ও বলেছে, আগে আমার গলা কাটো, তারপর গাছ কেটে নিয়ে যাও।"

এরপর মুখিয়াজী রামা ও আরও দু-চারজন ওর কাছে গিয়েছিলাম। সেদিনও সে গাছতলায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিল। ওর ছাগলগুলো ওখানে বসে কান নাড়ছিল। বাড়ির বউ-বাচ্চারাও গাছতলায় বসে। ওই নিমের ছায়ার একধারে তার বলদ দুটো বাঁধা। ওর কুকুরটা গাছের নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে।

আমাদের আসতে দেখে বালা একটা কুঠার নিয়ে এগিয়ে এল। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বালা এগিয়ে এল। ভাবলাম, আমি আগে আছি, রাগের মাথায় এই বিশালদেহী লোকটা যদি আমাকে মেরেই বসে, তাই আমি ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। বালাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখিয়াজী সামনে এগিয়ে গেল। বালা মুখিয়াজীর হাতে কুঠারটি দিয়ে বলল, "কাল মাস্টারকে বলেছি, গাছ কাটার আগে আমার গলা কাটতে, আজ আপনাকেও তাই বলছি।"

এই কথা বলে ও ফিরে গিয়ে নিমগাছের নীচে আঙুল দেখিয়ে

বলল, "ওই জানোয়ার আর ওই লোকগুলোকে মেরে তবে ঐ গাছ কাটতে আসবেন।"

বালার হাত ধরে মুখিয়াজী তাকে গাছের নীচে বসালো। বলল, "খোকা, মাথা ঠাণ্ডা করে বোস, যা বলছি শোন।"

হাত ছাড়িয়ে বালা উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে বলতে লাগল, "আমি কারও কথা শুনতে চাই না। আপনারা আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও আমি পাঠশালায় কোন সাহায্য করব না। গাছ আমি দেব না। যা হবার তা হবে।"

মুখিয়া এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বলল, "তুই বেকার চিৎকার করিস না। গাঁয়ের জন্য একটা গাছ দিলে তোর বাড়ি ডুবে যাবে না।"

"ডুবুক না ডুবুক, আমি গাছ দেব না।"

"এ কথা একেবারে পাকা?"

"হ্যাঁ। পন্থ সরকার যদি আসে তাও দেব না। ইংরেজ সাহেব এলেও না। কে আমাকে ফাঁসি দেয় দেখি।"

এসব শোনার পর মুখিয়াজী আমাদের ইশারা করে বলল, "তোমরা ফিরে চলো।"

বালার এই ব্যবহারে সবাই গরম হয়ে গেছে। ওর বাগানে ছায়ার জন্য একটাই গাছ ছিল, এ কথা সত্যি নয়। মুখিয়াজী সবাইকে চলে যেতে বললেও রামা নড়ল না। রাগের সঙ্গে বলল, "গাঁয়ের সবার বিরুদ্ধে গিয়ে তুমি ভাল কাজ করলে না বালা।"

বালা চিৎকার করে বলল, "আমার গ্রাম-সমাজ এসবের কিস্যু দরকার নেই। আজ আট বছর ধরে আমি আমার জমি-জায়গা নিয়ে পড়ে আছি। চিরকাল তাই থাকব। আমাকে ওই গ্রাম-

সমাজের ভয় দেখাতে এস না। খ্যাড়ার আবার বাটপাড়ের ভয় কিসের!”

এ কথা শোনার পর রামা ও আনংদা লাফিয়ে উঠে বালার কাছে এগিয়ে যেতেই মুখিয়াজী হাতের লাঠি দিয়ে ওদের পিছনে ঠেলে দিল এবং দৃঢ়কণ্ঠে বালাকে বলল, “বালা আজ যে কথা বললে, সারা জীবন যেন তা মনে থাকে। গাঁয়ের কারও কাছে যেন কোনদিন এস না।”

আর কোন কথা না বলে আমরা ফিরে এলাম।

পাঠশালার সামনে এসে বুড়ো বলল, “বালার কোন ব্যাপারে কেউ থেকো না। ওর ভেড়াদের, গরু-ছাগলদের অন্যের জমির ওপর দিয়ে কেউ যেতে দেবে না। ওর কঠিন আপদে-বিপদেও কেউ এগিয়ে যাবে না। দেখা যাক ওর তেজ কতদিন বজায় থাকে।”

দ্রুত সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে বালা মেষপালকের সঙ্গে গাঁয়ের সকলের হুঁকো-পানি বন্ধ হয়ে গেছে। এ খবর বাচ্চারা পর্যন্ত জেনে গেল। ওর সঙ্গে তখনই সেরকম ব্যবহার করাও শুরু হয়ে গেল। বালার ছেলে পাঁঠা কাটবার জন্য আয়বুকে ডাকতে এসেছিল। কিন্তু আয়বু যেতে অস্বীকার করেছে। বলেছে, “গাঁয়ের লোক তোমাদের একঘরে করে দিয়েছে, আমি যাব না।”

বালার ছেলে বলল, “কিন্তু গাঁয়ের সঙ্গে তোরই বা কী সম্পর্ক আছে? তুই তো বাইরের লোক। পয়সা নিয়ে কাজ করিস। আমার কাছেও তোকে বিনি পয়সায় কাজ করতে হবে না। এক সের, সওয়া সের যা লাগে চেয়ে নিবি।”

"তোমার ছটাক, মন-সের কিছুতেই আমার দরকার নেই। তুমি যাও।"

এ কথা জানতে পেরে বালা ছেলেকে খুব বকেছে। আর ছ' ক্রোশ দূর থেকে কসাই ডেকে তবে পাঁঠা কাটিয়েছে।

ওর ক্ষেতে ক্ষেত-মজুরের কাজ করার জন্য কেউ যেত না। বেশী মজুরি দিয়ে পাশের গ্রাম থেকে মজুর নিয়ে আসত। ওর বউ গ্রামের কুয়া থেকে দু-এক কলসী জল নিত, গাঁয়ের লোক তাও বন্ধ করে দিয়েছে। বালা এখন তিন মাইল দূরে এক কুয়া থেকে জল নিয়ে আসে। অন্যের জমির উপর দিয়ে গরু নিয়ে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। তার ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের ভেতর আসাও বন্ধ। বালার গ্রামে ঢোকাও নিষিদ্ধ। আর ওই গোঁয়ার লোকটাও নিজের জেদে অটল। গ্রামের লোক ওর শেষ দৌড় দেখবার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

পনেরো

আমার সব ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হল। অনেক উৎসাহ নিয়ে আখড়া তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলাম— সে কাজ ঢিমে তেতালায় এগিয়ে চলতে লাগল। কাঠের জোগাড় করতেই অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। পাহাড় থেকে পাথর কাটা হয়েছে।

কিন্তু সেগুলি গাঁয়ে নিয়ে আসতে বেশ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। সদর শহরে গিয়ে চুন আনতে হয়েছে। তাকে পিষতে হয়েছে। ইট কাঠ একত্র করতে হয়েছে। এইসব ছোটখাটো কাজে অনেক সময় বেকার নষ্ট হয়ে গেছে। এসব কাজে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমি মনে করতাম এই সব কারণেই বুঝি এত সময় লেগে যাচ্ছে। লোকজনদের তখন এ নিয়ে বকাঝকা শুরু করতাম। কিন্তু বনগরওয়াড়ীর সব লোকেরই এইরকম ঢিলেমি করে কাজ করা অভ্যেস। বাড়িতে কুয়ো তৈরি করার আগে তারা বলত খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সেই রকম সাহস আর উৎসাহ নিয়েই ওরা কাজে হাত দিত। কিন্তু পরে দেখা যেত সব কাজই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ঘর তৈরি হয়ে গেলে দরজা বাকী থেকে যেত, কখনও খুঁটি বাকী থাকত। কুয়ো তৈরি হয়ে গেলে কুয়োর পাড় বাকী পড়ে থাকত। দেওয়াল হয়ে গেলেও ছাদ বাকী পড়ে থাকত। কিছুদিন পরে লোক ডেকে এই অসম্পূর্ণ কাজ আবার শেষ করা হত।

এই ধরনের অসম্পূর্ণ কাজ গ্রামে খুঁজলে অনেক চোখে পড়বে। তাই আখড়ার কাজ ঢিমে তেতালায় চলায় গ্রামের লোকদের কাছে কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না। এরা রোজ নিজেদের কাজ করার পর তবে আখড়ার কাজে হাত দিত।

এই দায়িত্ব নেবার পর আমার খাওয়া ঘুম সব মাথায় উঠল। আট-দশদিন ধরে দাড়ি কামানো বন্ধ, স্নান খাওয়া ঠিকমত হয় না। ছুটি হলেও বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না। চুন, কাঠ, পাথর, খুঁটি এসব ছাড়া আমার মাথায় আর কিছুই ঢুকত না। গাঁয়ের

গরুর গাড়ি ভেঙে গেছে। পাথর আনতে গিয়ে সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মিস্ত্রীদের ঠকঠক আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। রাস্তার এখানে ওখানে পাথর ছড়ানো।

ঘুরতে ঘুরতে আয়বুর পায়ে কড়া পড়ে গেছে। অত্যন্ত খাটাখাটনির ফলে ওর শরীর খারাপ হয়ে যেতে আরম্ভ করল। আসলে আনংদাও দৌড়ঝাঁপের কাজ করতে লেগেছে। রামার ছেলে এসে নালিশ করল, রামা আখড়ার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নিজের ঘরের কোন কাজই করছে না। মুখিয়াজীর ক্ষেতও দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। তবু আখড়ার কাজের সঙ্গে গ্রামের সবাই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। গ্রামের এমন একজনও নেই যে কোন-না-কোন কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে নি।

এরই মধ্যে আর-একবার ফসল কাটার মরসুম চলে গেছে। একটা বছর দেখতে দেখতে চলে গেল। হালের কাজ শেষ। মেষপালকেরা এখন ভেড়ার পশম কেটে ধুনছে। চরখায়, তকলিতে উল পাকানো হচ্ছে। উলের লাছি তৈরি করে বাজারে বেচে পয়সা রোজগার করছে। সেই পয়সা দিয়ে সম্বৎসরের শাড়ি ধুতি জামা সব কিনছে। কেউ কেউ উল দিয়ে মোটা মোটা কম্বল তৈরি করিয়ে এনেছে। ভেড়াগুলি আবার দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিয়েছে। প্রথম বাচ্চারা এখন মায়েদের প্রায় ভুলতে বসেছে। গরম শেষ হয়ে গেছে। বর্ষা এল বলে। কিন্তু আখড়ার কাজ তবু শেষ হল না। আমি একবার নিজেকে দোষ দিচ্ছি, একবার অন্যের ওপর চেচাঁমেচি করছি। কিন্তু তবু কাজের গতি একদম বাড়ছে না।

বাইরের লোকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে, এ কাজ শেষ হবে না। মাস্টার মিছিমিছি মেষপালকদের কষ্ট দিল। এতগুলো টাকা নষ্ট করল। আর আখড়ার দরকারই বা. কী? ছেলেরা নাহয় খেলতে হলে ধানের ক্ষেতে খেলা করবে, বালির ওপর খেলবে। হবার হলে ঐ ধুলোয় খেলা করেই পালোয়ান হতে পারবে। আখড়া না হলে ওদের খেলা বন্ধ হবে না। আখড়া বানাবার এই পরিকল্পনা মাস্টারের। আর এটা সে করছে টাকা মারবার জন্য। মাইনের টাকায় পুরো চলে না তাই এমন একটা-কিছু শুরু করে মেষপালকদের ফাঁসিয়ে দেবার মতলব করে নিজের পকেট ভরবার তাল করেছে।

শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে ওপরওয়ালাকে লিখে পাঠালাম, "মহাশয় আখড়ার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। হুজুর এখন দয়া করিয়া একদিন দর্শন দিয়া ইহাব দ্বাবোদ্‌ঘাটন করুন।" চিঠি লিখে পাঠাবার পর আমি গাঁয়ের সবাইকে বলে দিলাম, 'সরকার বাহাদুর এই মাসেই আমাদের এখানে আসছেন। আখড়া শেষ করে নাহয় সরকার বাহাদুরের সামনে হাত জোড় করে বোলো, মহাশয়, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।'

দাদু কনফুসকা এখনও শয্যাশায়ী। তার বউ ও মা দুজনে মিলে ওঝা বদ্যি দিয়ে অনেক ওষুধ দিয়েছে কিন্তু কোন উপকারই হয় নি। কনফুসকা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকে। সারাদিন ভাল মন্দ খাবার কথা বলে আর চেঁচায়। আমি খাব, খুব খাব, দুধ ঘি, চিনি রুটি, খাসির মাংস, মুরগি। এই সব খেয়ে খেয়ে একদিন ঠিক জওয়ান হয়ে উঠব। বাড়ির লোক তার অভিপ্রায় অনুসারে খেতে দিত। কিন্তু বেচারা কনফুসকার এইসব ভালমন্দ খাবার

পেটে সহ্য হত না। এত খাওয়াদাওয়ার ফল কিছু হল না। সে আর জোয়ান হয়ে উঠল না।

বাল্য মেষপালক এখনও গ্রামের লোকদের কাছে মাথা নত করে নি। গ্রামের লোকের কাছ থেকে বাধা পেয়ে ওই জেদী লোকটি যেখানে ছিল সেখান থেকে এক চুলও হটে আসেনি। শেকু আর তার চেয়ে আধহাত লম্বা বউ ক্ষেতে কাজ করে চলেছে। মুখিয়াজীর অঙ্গী তার চঞ্চল চোখ মেলে সারা গাঁ ঘুরে বেড়ায়। আনংদা তার পুরনো স্বভাব-মত ছোটখাটো ছিঁচকে চুরি করে চলে। রামা যেমন ছিল তেমনি ঘুরে বসে কাটায়। তার বুড়ো বাবা এখনও পর্যন্ত গন্ধ শুঁকে শুঁকে দিব্যি ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়।

বনগরওয়াড়ীর জোয়ান ছেলেরা রোজ সকালে উঠে ভেড়া চরাতে যায়। সারাদিন ধরে ক্ষেতে, পাহাড়ি উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে ভেড়া মিলিয়ে গোয়ালে ঢোকায়। রাতের বেলা সজাগ থেকে ঘুমোয়। মেয়েরা রুটি বানায়, চরকায় সুতো কাটে আর বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়। এর মধ্যে একদিন সরকারের কাছে লেখা চিঠির উত্তর এল। এপ্রিল মাসের বিশ তারিখে সরকার বাহাদুর বনগরওয়াড়ীতে দর্শন দেবেন বলে লিখেছেন।

তখন থেকে চাকা জোরে জোরে চলতে লাগল। দু-একদিন পর পর সদর মহকুমার কর্তারা সব আসা-যাওয়া শুরু করেছে। কাজকর্ম দেখেশুনে যেতে লাগল তারা। সদর থেকে বনগরওয়াড়ী আসার রাস্তা ভাল করে তৈরি করা হল। যেখানে সদরের রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে সাদা পাথরের ফলক বসিয়ে গাঁয়ের পথ

নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির লোক একদিন গাঁয়ে এসে সব বেওয়ারিশ কুকুরগুলো মেরে ফেলল। গাঁয়ের আশপাশ সব পরিষ্কার করা হল। পাঠশালা মেরামত করে চুনকাম করা হল। যেখানে যেখানে নোংরা জমা ছিল সেসব সাফ করে ফেলা হল। একজন সরকারী কর্মচারী বলল, রাজাসাহেব হয়তো গ্রামে ঢোকার সময় প্রথমেই যে রামোশী মহল্লাটা পড়ে সেখানে যেতে পারেন। এ কথা শুনে রামোশী মহল্লা সাফ করার ধুম পড়ে গেল। প্রত্যেকটি ঘর লেপাপোঁছার ফলে ঝকমক করতে লাগল। রামোশীদের দেখাদেখি গড়ড়িয়ারা (মেষপালকেরা) বেশ উৎসাহ পেয়ে তাদের ঘরদোর পরিষ্কার শুরু করে দিল। অনেকদিন ধরে যেসব বাড়িতে লেপাপোঁছা হয়নি সেসব বাড়ির আবার তা ফিরল। অনেক বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। পাথর ধসে গিয়ে রাস্তায় পড়েছিল। রাস্তা থেকে সেসব পাথর তুলে আবার বসানো হল। কেউবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেউবা স্বেচ্ছায় যা কখনও হয়নি এমন কাজ করতে লাগল। স্নান সেরে ঠিকমত চুল আঁচড়ে কাপড় পরে মেষপালকের ছেলেদের যেমন ফিটফাট দেখতে লাগছিল তেমনি দেখাতে লাগল গোটা গ্রামের চেহারা।

আখড়ার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেওয়াল হয়ে গেছে। মাচা তৈরি শেষ। রাজমিস্ত্রিরা তাদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু ছুতোর মিস্ত্রিদের তখনও চৌকাঠ বসানো, খিল বসানো প্রভৃতি দরজার কাজ বাকী।

স্বয়ং সরকার এ গ্রামে আসবেন এ বিশ্বাসে গাঁয়ের সবকিছু যেন বদলে গেল। মেষপালকেরা তাদের রাজাকে কোনদিন দেখেনি। সেই রাজাসাহেব তাদের গাঁয়ে আসছেন। এ যেন এক অলৌকিক

ঘটনা। এর ফলে গ্রামের লোকদের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগল। আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরা হিংসায় জ্বলতে লাগল। এই গাঁয়ে যাঁরা কোনদিন আসত না, সেই সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ, দারোগা প্যাটেলরা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে লাগল। যত দিন এগিয়ে এল ততই কর্মকর্তাদের আসা-যাওয়া বেড়ে গেল।

এদিকে আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। সভার জন্য চেয়ার আনা, টেবিল আনা, ফুলদানি আনা, পাঠশালার বাচ্চাদের জন্য নতুন জামা তৈরি করা, রাজা আসার জন্য এই ধরনের নানান কাজের চাপ বেড়ে গেল। আর আমাকে সেইসব কাজের জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হল।

আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় আখড়ার উদ্‌বোধন। অথচ এখনও পর্যন্ত আখড়ার ছাদ ছাওয়া হয়নি। এখন দুপুর তিনটে অথচ ইমারতের ওপরটা খোলা পড়ে রয়েছে। আমি একটু বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মহারাজ এসে যদি খোলা ছাদ দেখেন তাহলে? আমার সমস্ত মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। গাঁয়ের বদনাম হবে। মুখিয়াজীকে গিয়ে বললাম, "মুখিয়াজী, গাঁয়ের সব সম্মান যে নষ্ট হয়ে যাবে। আসছে কাল রাজাসাহেব আসবেন আর আজ এখনও পর্যন্ত ঘরের ছাদ ছাওয়া হয়নি।" মুখিয়াজীও ঘাবড়ে গেল, "ছোকরা বলে কি? আরে সবাইকে ডাকো, মাটি তৈরি করো। ছাদ হতে দেরী হবে না।"

গাঁয়ে আবার দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। সবাই কাজ ফেলে ছাদ তৈরির জন্য চলে গেল। দেখতে দেখতে একশো সওয়াশো লোক মালকোঁচা বেঁধে জড় হয়ে গেল। মেষপালকেরা হাতে

হাতে মাটির দলা ছাদে নিয়ে যেতে লাগল। ঘরের ছাদ তৈরি শুরু হয়ে গেল।

তালে তালে 'এ হ্যাঁ, এই নাও, আয় আয়' শব্দ করতে করতে ছাদ তৈরি করতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিক অন্ধকার। আগের থেকে গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত ছিল, সেই আলোতে কাজ চলল। একটু থামলেই মুখিয়াজী চিৎকার করত, আয়বু চেঁচাত। আবার সবাই এসে কাজ শুরু করে দিত। সোরগোল পড়ে যেত। সারা গ্রাম সারা রাত ধরে জেগে থাকল।

প্রধান তোরণ তৈরি করা হল। রাজাসাহেবকে স্বাগত জানাবার জন্য একটি তোরণ। সরকার বাহাদুর গাঁয়ের সিংহদ্বার পর্যন্ত এলে তাঁকে একুশটা বলদে টানা রথে করে গ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। এজন্য বলদ জোগাড় করা হল। রথকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হল। বন্দোবস্ত কেমন হচ্ছে দেখার জন্য দারোগা সাহেব এসে হাজির হলেন। তিনিও কাজের তদারক আরম্ভ করলেন।

গভীর রাত্রি, কাজ প্রায় শেষ। ছাদের ওপরে কিনারে দাঁড়ানো আয়বু নীচের লোকদের হাত থেকে মাটির দলা লুফতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল। 'মরে গেলাম, মরে গেলাম' বলে সে চিৎকার করে উঠল। আমি তখন পাঠশালায় বসে আগামীকালের অনুষ্ঠানসূচী লিখে চলেছি। মুখিয়াজী শোভাযাত্রার রথ সাজাতে ব্যস্ত। রামা তোরণ সাজাচ্ছে। আয়বু যখন পড়ে গেছে, তখন আমাদের একজনও সেখানে ছিল না। ও পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। যারা কাজ করছিল, তারা কাজ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল, "কসাই মরে গেল— কসাই মরে গেল।"

প্রথম থেকে এত হট্টগোল হচ্ছিল যে এইসব চেঁচামেচি আওয়াজ আমার কানে পৌঁছয়নি। আনংদা খবরটা কারও কাছ থেকে শুনে মুখিয়াজীর কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল যে, "আয়বু কপাই পড়ে গেছে।"

মুখিয়াজী দেখল সবাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, চিৎকার করে বুড়ো বলল, "তোমরা কাজ থামিয়েছ কেন? কপাই পড়েছে, তাকে পড়তে দাও। তোমরা নিজেদের কাজ করো।" ওদের সবাইকে ডেকে মুখিয়াজী আবার ছাদে তুলে দিল। তারপর আয়বুকে ধরে আমার ঘরে নিয়ে এল। আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। ভোরের মুরগিরা ডেকে উঠল। একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। একটু পরেই মোটর গাড়ি আসবে। কারও মরবার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। এখনই মোটর এসে পড়বে। এখন আয়বুর জন্য কেই-বা কাঁদবে? পেঁয়াজ কেটে আয়বুকে শোঁকানো হল। মাথায় চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। কিন্তু আয়বুর চোখ তবু খুলল না। তখন আয়বুকে ওখানে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মুখিয়াজী বাইরে এসে কাজ শেষ করতে লেগে গেল।

ছাদ ছাওয়া শেষ। ভোর হয়ে গেছে। গায়ের ধুলো কাদা ধুয়ে স্নান করার জন্য লোকেরা কুয়োর দিকে চলে গেল।

চার-ছয়জন রামোশিয়াকে আগেভাগে রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছি। শানাইওয়ালাকে গাছের উপর বসানো হয়েছে। কারণ অনেক দূর থেকে মোটর গাড়ি দেখতে পেলেই সে শানাই বাজিয়ে ইশারা করবে।

আর ঠিক আটটা সওয়া আটটার সময়, ইশারার শানাই বেজে

উঠল। "এসে গেছে, এসে গেছে, সরকার এসে গেছে" বলতে বলতে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। বাচ্চা কোলে মেয়ে বউরা পর্যন্ত প্রধান তোরণের দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশ, দারোগা, সবাই রেডি হয়ে সরকার বাহাদুরের গাড়ি আসবার অপেক্ষা করছে। তারা ওদের ধমক দিয়ে প্রধান তোরণের সামনে থেকে হটিয়ে দিল। রথে বলদ জুতে আমি তৈরি হয়ে ছিলাম। এ গ্রামের নিয়ম, গাঁয়ে রাজার শুভাগমন ঘটলে গাঁয়ের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি প্যাটেলদের কেউ হাতে একটি নারকেল আর টাকা নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু এ গ্রামে প্যাটেল পাটোয়ারী কেউ ছিল না। পাশের গাঁ থেকে আসা একজন প্যাটেল এই সুযোগে রাজার সামনে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যেতেই আমি তাকে বাধা দিলাম। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, মাড়ের গন্ধ ভরতি লাল কোরা নতুন কাপড় পরা আমাদের বুড়ো মুখিয়াজীই নারকেল আর টাকা হাতে নিয়ে সরকার বাহাদুরকে স্বাগত জানাবে। কয়েকজন এয়োস্ত্রীকে প্রদীপ হাতে আগে দাঁড় করানো হয়েছে। রাজা মোটর থেকে নামলেই তারা এগিয়ে গিয়ে আরতি করবে। প্রত্যেকে রুদ্ধশ্বাসে গাড়ি আসবার অপেক্ষা করছে। রামোশিয়াদের বাচ্চারা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, "রাজাসাহেবের গাড়ি মাওলী মায়ের মন্দিরের কাছে এসে গেছে।"

সবাই টুপি, পাগড়ি আর-একবার দেখে নিল ঠিক আছে কী না। বড় বড় কর্তারা কোটের বোতাম বন্ধ করে ভেতরের শার্ট নিচে টান টান করে গুঁজে দিল। রাস্তায় দাঁড়ানো সিপাহী হুঁইশিল বাজাল। সরকারের লাল গাড়ি সিংহদ্বারে এসে থামল।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাও ছিলেন। শিক্ষা-অধিকর্তা ঝুঁকে পড়ে সরকারকে নমস্কার করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি এখানকার মাস্টার।" দুহাতের আংটি ভরা আঙুল জোড় করে ওপরে তুলে সরকার বললেন, "জয় প্রভু।"

সবাই মাথা নীচু করে তাঁকে নমস্কার করল। মেষপালকেরা সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণিপাত করল।

তহশীলদার একটু এগিয়ে নমস্কার করে বলল, "এখান থেকে রথে করে গাঁয়ের ভেতর যাবার জন্য এরা নিবেদন করছেন রাজাসাহেব।"

সরকার বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ— চলো-না।"

ভৃত্য তখন গাড়ির দরজা খুলে দিল। রাজা বাইরে বেরিয়ে এলেন। মেষপালকেরা তাদের রাজাকে দেখল— ফর্সা, ভব্য, সৌম্য। তাঁর মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে খাদির শাদা লম্বা কোট, চুড়িদার পায়জামা, পায়ে লাল জুতা, চওড়া বুকে ঝলমলে পট্টি লাগানো। বড় বড় চোখ, উন্নত নাক, আধপাকা ঘন গোঁফওয়ালা রাজাকে ছড়িতে ভর করে রথের দিকে এগুতে দেখে মেয়ে-বউরা বলাবলি করতে লাগল, "রাজা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ছড়িতে ভর করে চলতে হচ্ছে।" আমি মুখিয়াজীকে ইশারা করতে তিনি সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে নারকেল আর টাকার থালা রাজার সামনে ধরলেন। রাজা সেগুলি হাত দিয়ে স্পর্শ করে মুখিয়াজীর কাঁধে এক হাত রেখে বললেন, "কি প্যাটেল, ভাল তো?" মুখিয়া একটু সন্ত্রস্ত হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ সরকার, আজ্ঞে হ্যাঁ সরকার।"

রথে ওঠার সময় রাজা মুখিয়াজীর কাঁধে ভর করে রথে গিয়ে

বসলেন। রথ চলতে লাগল। বাঁশি বাজল। শানাই বাজল, ঢোলও বেজে উঠল। মেষপালকেরা রাজার জয়জয়কার করে উঠল। পাঠশালার ছেলেরা ধ্বনি দিয়ে উঠল "মহারাজা চিরায়ু হো"। এয়োতিরা প্রদীপ নিয়ে আরতি করতে করতে সামনে এগিয়ে চলল। রাজা মেষপালকদের গ্রামে এসে ঢুকলেন। এলেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর মেষপালকদের এই গ্রামে।

আখড়ার বন্ধ দরজা রাজা নিজের হাতে খুললেন। আবার শানাই বেজে উঠল। কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। এত বড় আখড়ার লাল মাটি দেখে রাজা খুব খুশী হলেন। বললেন, "কোথায় তোমাদের সেই মাস্টার ?"

আমি হাত জোড় করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

"বেশ, বেশ, খুব ভাল করেছ বাবা। তোমার নামটা কি ?"

"আজ্ঞে, রাজা রাম বিট্‌ঠল সৌঁদনীকর।"

তহশীলদার সাহেব ভাল করে রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন, "বিট্‌ঠল ধোংরোর ছেলে। আমাদের ওখানে ওর বাবার আসা-যাওয়া আছে।"

সরকার বললেন, "খুব ভাল। শুনে খুব খুশী হলাম। জ্ঞানের সঙ্গে শক্তিরও উপাসনা হওয়া উচিত।"

আনন্দে আমি গদগদ হয়ে উঠলাম। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেল। আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে উঠল।

আখড়ার হনুমানজীর মূর্তিতে রাজাসাহেব স্বয়ং গিয়ে নারকেল চড়ালেন। এরপর সভা শুরু হল। আমি আমার ভাষণ লিখে এনেছিলাম, সেটি পড়ে শোনালাম, পড়বার সময় আমার বুক কাঁপছিল।

আমার ভাষণে আমি বললাম, খেলার জন্য যাতে বাচ্চারা এক জায়গায় এসে মিলতে পারে, যাতে খেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের পাঠশালার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই আখড়া তৈরির কথা চিন্তা করি। এর জন্য গাঁয়ের লোক যে সাহায্য যে পরিশ্রম করেছে, তার জন্য আমি তাদের প্রশংসা করি, আর হুজুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

রাজাসাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। বললেন, এই মেষ-পালকের বাচ্চারা এত ছোট গ্রামে এত সুন্দর আখড়া বানিয়েছে যা দেখে আমার মন আনন্দ আর গর্বে ভরে যাচ্ছে। আমার রাজ্যের আদর্শ হল শক্তির উপাসনা আর জ্ঞানের চর্চা। আমার রাজ্যের প্রতিটি ছাত্রের বুক চওড়া হোক, বাহুতে বল হোক, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হোক, এটাই আমি দেখতে চাই। এ কথাই আমি বার বার বলে আসছি। কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার এই কথা মেষপালকদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং তার বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে। এ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আপনাদের রাজার বুক এর ফলে দু-ইঞ্চি ফুলে উঠল। জগদম্বা আপনাদের সৎবুদ্ধি দিন। আপনাদের কল্যাণ হোক।

এরপর আমি ধন্যবাদ দিলাম। সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা 'বন্দেমাতরম' সমাপ্তি সংগীত গাইল। সভা শেষ হল। মহারাজার মোটর ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। অফিসাররা কেউ সাইকেলে, কেউ গরুর গাড়ি করে চলে গেল। এরপর অনেক দিন পর্যন্ত মেষপালকদের ঘরে এই সভার বিষয় নানান আলোচনা চলল। রাজাকে কেমন দেখতে লাগছিল, কেমন

করে তিনি কথা বললেন— এই সব কথা অনেক দিন ধরে আলোচনা হল।

রাজা চলে গেলেন, উৎসব শেষ হল কিন্তু মেষপালকদের আনন্দ শেষ হল না। তারা জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়ে জোরে জোরে এইসব আলোচনা চালাতে লাগল। এই আনন্দ তাদের বেশ কিছুদিন ঘিরে রইল।

এই আনন্দ-উৎসবে দুজন মাত্র উপস্থিত ছিল না। বালা গড়রিয়া আর দাদু কনফুসকা। বালা জানত, রাজা আসছেন। কে যেন ওকে বলেছিল, চলো দেখে আসি। তা সে জবাব দিয়েছিল, "নিজের কাজ ছেড়ে আমি যাব না। রাজা এসেছে বলে কি আমার হাঁড়ি চড়বে না নাকি?"

কনফুসকাকে আসবার জন্য মুখিয়াজী অনেক অনুরোধ করেছিল। তার পক্ষে বিছানা ছেড়ে ওঠা অসম্ভব। মুখিয়াকে বাড়িতে ডেকে সে বলল, "আমার রাজাকে দেখার খুব ইচ্ছে। কেউ আমায় পিঠে করে নিয়ে চলো।"

কিন্তু মুখিয়াজী ভয় পেল। যেমন কাছাখোলা লোক। আজেবাজে কি বলে বসবে। হয়তো মারধোরের কথা তুলবে। এইজন্য সে তাকে আসতে দিল না। কনফুসকা সবাইকে গালি দিতে লাগল। চেঁচাতে লাগল। কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা দিল না।

উৎসব শেষ হবার পর কে যেন আমাকে বলল যে আয়বু পড়ে গেছে, খুব লেগেছে। তার বাড়িতে তাকে রাখা হয়েছে। শুনে আমার আনন্দ ও উৎসাহ এক নিমেষে উবে গেল। দুরু দুরু বক্ষে ঘরে এসে দেখি আয়বু অচৈতন্য হয়ে কম্বলের উপর

পড়ে আছে। আমার বুক কেঁপে উঠল। "রাজা গাঁয়ে এসেছে বলে কি আয়বু নিজেকে নিজে বলিদান দিল?"

আমি জোরে জোরে ডাকলাম, "আয়বু, আয়বু— কী হয়েছে?"

অর্ধেক চিত হয়ে শুয়ে থাকা আয়বুর মুখের দিকে তাকালাম। লাল চোখ দুটো খুলে সে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে পড়া ওর গরম নিশ্বাসের হলকা আমার গায়ে এসে লাগল। একটুখানি চোখ তুলে চোখ বন্ধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় গুমরে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আয়বু, তোমার কী হয়েছে? খুব লেগেছে? কী হয়েছে তোর বলবি তো?"

আয়বু চোখ খুলে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "মাস্টারমশাই, রাজা এসেছিল?"

"হ্যাঁ, এসে চলে গেছেন। তোমার কী হয়েছে আয়বু? কেমন করে পড়ে গেলে?"

আয়বুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। সে বলল, "রাজা এলেন আর আমি দেখতে পারলাম না।" বলে আবার কাত হয়ে সে শুয়ে পড়ল।

ষোলো

রাজা এসে চলে গেলেন। আখড়া চালু হয়ে গেল। যেটুকু কাজ বাকী ছিল, শেষ হয়ে গেল। ব্যায়াম করার জন্য বাচ্চারা সব একত্র হতে লাগল। ডন বৈঠক, আসন, মুগুর ভাঁজা— সবরকম কসরৎই শুরু হয়ে গেল। গাজন নাচের ঢোল, করতাল, লাঠি, পট্টি, সারা সরঞ্জাম আখড়ায় এনে রাখা হল। আখড়ার লাল ধুলামাটিতে বয়স্ক লোকেরাও এসে কুস্তি করা শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালাও চলতে লাগল। সকাল-দুপুরে কুড়ি-পঁচিশ জন ছেলে নিয়মিত আসতে লাগল।

আখড়ার ওপর থেকে পড়ে যাবার ফলে আয়বুর হাত ভেঙে যায়। আনংদা আয়বুর হাত ভাল করার জন্য ওদের জাতের একজন রামোশীকে আমার কাছে পাঠাল। তার নাম জগন্না। বয়সে তরুণ। দেখতেও বেশ। সে রোজ ঘরে এসে আয়বুকে মালিশ করে দিত। আনংদা বলত যে জগন্না এই হাড় জোড়বার কাজ ওর বাবার কাছ থেকে শিখেছিল। ওর বাবা গাঁয়ের সবচেয়ে বড় শিকারী ছিল। বন্দুক দিয়ে সে অনেক হরিণ মেরেছে। চার কামরার বাড়ি ভরতি হরিণের শিং সাজানো। বুড়ো হবার পর সে হরিণের মত চেঁচাত সব সময়। মরবার সময়ও সে হরিণের মত চেঁচাতে চেঁচাতে মরেছে।

জগন্নার মালিশে আয়বুর ভাঙা হাড় জোড়া লেগে গেল। দিন পনেরো পরই আয়বু আগের মত চলতে ফিরতে পারল। কসাইর ছেলে মরতে মরতে বেঁচে গেল। তার উদ্ধারকর্তা জগন্না মাঝে এমন একটা অপকর্ম করল যার জন্য গাঁয়ের সবাইকে ভুগতে হল।

বনগরওয়াড়ী থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে ওয়াংগী গ্রাম। আমাদের গ্রামের সব মামলা মোকদ্দমায় এই গাঁয়ের লোকেরা দালালি করত। খুন মারপিটের জন্য ঐ গ্রামের খুব বদনাম ছিল। গ্রামের সবাই যেন রক্তের মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকত। পাঠশালার মাস্টার, প্যাটেল, পাটোয়ারি ওই গ্রামে বদলি হবার কথা শুনলে ভয়ে কাঁপত। এমনকি তহশীলদার পর্যন্ত গ্রামের লোকদের সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলতেন। ভিক্ষা চাওয়ার মত করে খাজনা চাইতেন। জগন্নাকে কাজের জন্য প্রায়ই এ গ্রামে আসতে হত।

একদিন দুপুর বেলা আট-দশ জন জোয়ান লোক বনগরওয়াড়ী এল। তাদের কারও হাতে কুঠার কারও হাতে লাঠি। সিলকের পাগড়ি আর মখমলের জামা পরা লোকগুলো সোজা রামোশী মহল্লায় এসে উপস্থিত হল। তাড়াতাড়ি তারা রামোশীদের ঘরগুলোতে তল্লাশী চালালো। মেয়েদের ওপর চোটপাট শুরু করে দিল। দু-একজন রামোশীর মাথায় কুঠারের বাড়ি মারল। রামোশী মহল্লায় হৈ-হল্লা পড়ে গেল। বাচ্চারা ভয়ে কাঁপতে লাগল। কুকুরগুলো ডাকতে লাগল; ভয় পেয়ে রামোশীদের বউরা মেষপালকদের মহল্লায় চলে এল। ওই মহল্লার পুরুষেরা তখন মাঠে। বাড়িতে চাকর পর্যন্ত বড় একটা নেই। এই পরিস্থিতিতেই ওই কাটখোট্টা লোকগুলো যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশী চালাতে লাগল তখন চারদিকে আর্তরব শুরু হয়ে গেল।

আমি তখন পাঠশালাতে ছিলাম। আনংদাও ছিল, রামোশী মহল্লায় লোক ঢুকে সব-কিছু তছনছ করছে শুনতে পেয়ে সে ঐ দিকে রওয়ানা হল। পাঠশালা ছেড়ে আমিও পেছনে পেছনে গেলাম।

এর মধ্যে ঘরবাড়ী তল্লাশ করে লোকগুলো রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। আনংদা এগিয়ে গিয়ে বলল, "কি হয়েছে?" আনংদা এক মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছিল যে ওরা ওয়াংগী গাঁয়ের লোক।

আনংদা 'কি হয়েছে' জিজ্ঞাসা করায় একটা ছেলে আনংদার দিকে তেড়ে এসে বলল, "তুই রামোশী, তাই না?" উত্তর দেওয়ার আগেই আনংদার পিঠে তুটো লাঠির বাড়ি এসে পড়ল। লোকটি আনংদাকে ধমক দিয়ে বলল, "জগন্না কোথায়?" তুবার লাঠির বাড়ি খেয়ে আনংদা পিছু হটতে হটতে বলল, "কেন? কী করেছে সে?" ছোকরা আনংদার কথা শুনে তার পিঠে আরও কয়েক ঘা লাগাল। এই সব দেখে আমি থাকতে না পেরে ঐ ছেলেটার হাত ধরলাম। বললাম, "তোমরা কে? হঠাৎ গাঁয়ে ঢুকে এরকম মারপিট শুরু করেছ কেন? তোমরা কি ভেবেছ, তোমাদের বাধা দেবার কেউ এ গ্রামে নেই?"

আমি রোগা পাতলা হলেও আমার গলার আওয়াজ খুব জোর হওয়ায় ছেলেটা কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার হাত ছাড়িয়ে নিতে ভুলে গেল। তখন একজন মোটাসোটা লোক ওদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে ছোকরাকে টেনে নিয়ে আমার বুকের সঙ্গে প্রায় বুক লাগিয়ে বলল, "তুমি কে হে ছোকরা, খুব যে রোয়াব হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি সরকারী চাকর, এখানকার পাঠশালার মাস্টার।

আপনাদের কাউকে যদি দরকার থাকে ঠিক করে বলুন। মারপিট করার জন্য এটা কোন অন্ধকার শহর নয়।"

এর মধ্যে একটা লাঠি হাতে আয়বু আর পাঠশালার চার-ছটি ভাল ভাল ছেলে সেখানে এসে হাজির হল।

আমার বুকে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে জওয়ান ছোকরা সে এদিক-এদিক তাকিয়ে একটু নরম হল। বলল, "জগন্না রামোশীকে আমাদের দরকার।"

আমি বললাম, "সে তো গত দু-চার দিন ধরে এই গ্রামে নেই।"

"কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ কি?"

"আমি বলছি এটাই প্রমাণ।"

"আরে তোমার গায়ে দেখছি বেশ তাগদ হয়েছে মাস্টার।"

এর মধ্যে গ্রামের এক বুড়ি এসে ঐ পাগড়িওয়ালা লোকটার হাত ধরে বলল, "আরে বাছা গরীব রামোশীদের ওপর কেন কুড়োল চালাচ্ছ? তুমি হলে খানদানি মারাঠা। রামোশীরা তো তোমার পায়ের খেলার বল। শান্ত হয়ে বোসো। রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এসেছ। কোন কাজ থাকলে মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করো।"

চারিদিকে শোরগোল তুলে রামোশীদের মেয়ে-বউরা তৎক্ষণে সেখানে এসে জড় হয়েছে। মেষপালকদের বউরাও এসেছে। নিজেদের ভাষায় কটু কথা বলে তারা গালাগাল দিতে লাগল।

আমি ওয়াংগীদের বুঝিয়ে বললাম, আপনারা আমাদের আখড়ায় চলুন। ওখানে বসে বলুন আপনারা কী চান। কেন এখানে এসেছেন, শুধু শুধু মারপিট করে কী লাভ? কি জানি কি ভেবে ওরা বলল, চলুন। বাচ্চাদের দল পিছন পিছন আসতে শুরু করল। মেয়ে-বউরাও আসতে লাগল। তাদের ধমক দিয়ে সরাতে হল।

আমি আনংদা রামা ওদের সবাইকে নিয়ে আখড়ায় এসে বসলাম। বললাম, এখন বলুন তো কি ব্যাপার ? ওদের মধ্যে একজন বলল, "আমরা ওয়াংগী গ্রামের লোক। তোমাদের গ্রামের জগন্না রামোশী আমাদের জাতের এক সুন্দরী বিধবাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাকে খুঁজতে আমরা এখানে এসেছি।"

কেন এরা এতক্ষণ এমন মারপিট করে তল্লাসী করছে, আমি এতক্ষণে সহজেই বুঝে গেলাম। ওদের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। জগন্না যে এরকম কাজ করে বসবে, তা ভাবাই যায় না। বাবা ও আনংদাও এ খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

জগন্নাকে গাল দিয়ে আনংদা বলে উঠল, "ঘরে নেই খাবার, বেটা আবার মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে। প্যাটেল, আপনারা বিনা দ্বিধায় ওর জান নিয়ে নিন। গ্রামের কেউ কিছু বলবে না।"

আনংদার কথা শুনে ওরা আশ্বস্ত হল। বলল, "মেয়েটি বিধবা ছিল, তার আর কেউ ছিল না, এটি সারা গ্রামের ইজ্জতের প্রশ্ন। একজন রামোশী আমাদের গ্রামের মেয়ে নিয়ে পালিয়েছে, এতে আমাদের মুখে চুন-কালি পড়েছে।"

আনংদা বলল, "সে এখানে থাকলে আপনাদের সামনে তাকে নিয়ে আসতাম। নিজের হাতে ওর মাথায় পাথর ভাঙতাম।"

ওরা বলল, "যাবে কোথায় ? যেখানেই থাকুক সেখান থেকেই ওকে খুঁজে বার করব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরে ও যাবে কোথায় ? ওর কি ক্ষমতা আছে যে চিরদিন পালিয়ে থাকে।"

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে কি বলব। এই পাজী লোকগুলো যেভাবে জগন্নার পেছনে লেগেছে তাতে ওকে ধরতে

পারলে মেরেই ফেলবে। তাতে ওরা একটুও ভয় পাবে না। আনংদা বলল, "হুজুর সে যেমন আপনাদের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তেমনি রামোশিদের সম্মানও নষ্ট করেছে। আপনারা চলে যান। আমি মায়ের দিব্যি করে বলছি যে ঐ বিধবা আর জগন্নাকে আট দিনের মধ্যে আপনাদের সামনে হাজির করব।"

ওয়াংগীরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লাগল। আনংদা বলল, "কী মাস্টারজী ঠিক বলি নি?"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো। জগন্না যদি দোষ করে থাকে তাহলে তাকে ধরে এদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই।"

ইতিমধ্যে আয়বু সারা গ্রাম ঘুরে ধামা ভরতি চীনাবাদাম আর দেড় সরা গুড় একত্র করে ওয়াংগীদের সামনে রাখল। একটু পরে মাটির ভাঁড়ে করে চা এল। চীনাবাদাম খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অতিথিদের খুব যত্ন করে চা খাওয়ানো হল।

আনংদাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে আমাকে সাক্ষী রেখে তারা চলে গেল। আমি তাদের গ্রামের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। ফিরে এসে আমি তাকে বললাম, "কী রে আনংদা, জগন্নাকে যদি না পাওয়া যায়?"

আনংদা কেশে বলল, "আমি যদি ওকে খুঁজে বার করতে না পারি তাহলে আমি রামোশীর বাচ্চাই নই। মাস্টারজী, ওকে মশানে যেতে দিন। পিছমোড়া করে ওকে বেঁধে যদি না নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার নাম নেই। আপনি দেখে নেবেন।"

খুব ভোরবেলা উঠে আনংদা রামোশী খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল জগন্নাকে। সঙ্গে আরও দু-তিনটি ছেলে। হাতে লাঠি ও কুড়াল নিয়ে যেমন তিন-চারজন মিলে হরিণ শিকারে যায় তেমনি ওরা

আনংদার পিছু নিল। গ্রামের রামোশীদের গতিবিধি আনংদার ভাল করেই জানা। জগন্না এখান থেকে গেছে দুদিন। এই দুদিনে এতটা পথ হেঁটে তারপর মোটরে করে স্টেশনে গিয়ে বোম্বাই পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ ও জানে যে ওর যাওয়ার পরই সবাই তাকে খুঁজবে। প্রথমে মোটর-রাস্তা ধরে, তারপর স্টেশনে ওকে খোঁজা হবে। ভাই স্বাভাবিকভাবে এমন জায়গায় ও যাবে যেটি অনেক দূর অথচ, সেখানে কেউ তার খোঁজ পাবে না। ওর চেনাজানা জায়গা গ্রামের ভেতর অনেক ছিল। কিন্তু বারো ক্রোশ দূরে নিমরজ গাঁয়ে জগন্নার এক বোনের বাড়ি। আনংদার ওই গ্রামের কথা মনে পড়ল। দুপুরবেলা খাওয়ার সময় জগন্নার ভগ্নিপতির বাড়ির দরজায় গিয়ে সে কড়া নাড়ল। অতিথিদের আসতে দেখে জগন্নার বোন খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। ধার করে আটা এনে অতিথিদের গরম গরম তরকারী ও রুটি করে খাওয়ালো। খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে জগন্নার ভগ্নিপতির সঙ্গে কথা শুরু করল। হঠাৎ আনংদা জিজ্ঞাসা করে বসল, "জগন্না এসেছিল নাকি?" ভগ্নিপতি একটু চমকে উঠল। জবাব দিল, "আজ্ঞে না তো, এখানে তো আসে নি।"

কিন্তু আনংদা ঠিক আন্দাজ করল। ভগ্নিপতির চমকে ওঠাটা ওর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নি। সে বুঝে গেল যে জগন্না এখানেই আছে বা এখানে সে এসেছিল। আনংদা জগন্নার ভগ্নিপতিকে বলে দিল, জগন্না এক মেয়েমানুষকে ফুসলে তুলে এনেছে। আনংদা বলল, "আপনাদের মিথ্যে কেন বলব? জগন্নার বোকামির জন্য গ্রামের সবাইকে অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে। ওয়াংগীদের গ্রামের ভাল

ঘরের একটা মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে। একশো লোক এরপর কুড়াল হাতে আমাদের গ্রামে চড়াও হয়। আমি ওয়াংগী গ্রামের লোকদের পা ছুঁয়ে বলেছি যে জগন্নাকে আট দিনের মধ্যে খুঁজে বার করে তাদের হাতে তুলে দেব। আপনারা গ্রামের কোন ক্ষতি করবেন না। লোকেরা ফিরে গেছে। নয়তো সেদিন গ্রামে দু-চারটে লাশ পড়ে যেত।"

ভগ্নিপতি বোধহয় এত ব্যাপার জানত না। তাই তার মুখ ভার হয়ে গেল। এদিকে জগন্নার বোন ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির হয়ে পড়ল। কিন্তু জগন্না যে এসেছে এ কথা স্বীকার না করে তার ভগ্নিপতি বলল, "সত্যিই সে খুব অন্যায় করেছে, নিজের ক্ষমতা না জেনেই জগন্নার এমন কাজ করা মোটেই ভাল হয় নি। মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগে যাওয়া এমন কিছু অপরাধ নয় কিন্তু যদি নিজের জাতের হয়। জগন্নার ভগ্নিপতি পরে বলল, "আচ্ছা ওকে পেলে আপনারা কি করবেন? মেয়েটির যে ইজ্জত নষ্ট হয়েছে সে তো আর ফিরবে না। তাকে আর কোন জাতেই নেওয়া যাবে না। মারপিট করুন বা ওকে মেরেই ফেলুন, যা হয়ে গেছে, তা কি আর ফিরে আসবে?" আনংদা বলল, "না, তা অবশ্য নয়।"

"তাহলে আর আপনি এ ব্যাপারের মধ্যে থাকছেন কেন? দুজনকে প্রেমলীলা করতে দিন। মিয়া-বিবি রাজী, তা কি করবে কাজী?"

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভগ্নিপতির কথাই ঠিক। কিন্তু সে ভুলে যাচ্ছে যে জগন্না যখন প্রেমলীলা করবে তখন ওয়াংগী গ্রামের লোকেরা রামোশীদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। সবাইকে মারধোর করবে। ওর একার জন্য সারা গাঁয়ের লোককে কষ্ট করতে

হবে। ওই ছোট্ট গ্রামে কত লোকই বা আছে আর তাদের শক্তিই বা কত? আনংদা এসব কথা ভগ্নিপতিকে বুঝিয়ে বলল। কিন্তু ভগ্নিপতি তার শ্যালকের কোন কথাই আনংদাকে বলতে রাজি হল না। কোনরকমে আনংদা তার কাছ থেকে জগন্নার কোন খবরই আদায় করতে পারল না। অগত্যা আনংদাকে উঠতে হল। সে বলল, "ঠিক আছে, আমিও দেখছি কিছু করতে পারি কী না। জয়রামজী।"

ভগ্নিপতিও নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ পরে জগন্নার বোন বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আনংদা শোন, জগু এখানে এসেছিল।"

স্বামী তার দিকে কটমট করে তাকাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জগন্নার বোন মুখ বন্ধ করল না। বলল, "জগু স্টেশনে গেছে। মেয়েমানুষটাকে নিয়ে আংগলী যাবে বলে মনে হল। কিন্তু ওকে তোমরা প্রাণে মের না। আমার দিব্যি দেওয়া রইল।"

আনংদা বলল, "আমি কথা দিচ্ছি। ওকে আমি কিছু করব না। ওর জন্য কি আমার প্রাণেও কম ব্যথা লাগছে? আমি কি করে ওর গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেব? তা ও এখান থেকে কবে গেছে?"

"খুব সকালে ওরা গেছে, এখনও নিশ্চয় গাড়ীতে বসে নি।"

মিরাজে যাওয়ার গাড়ি বেলা তিনটেয় স্টেশনে আসে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে, বার-বার সান্ত্বনা দিয়ে আনংদা ওখান থেকে চলে গেল। চপ্পল খুলে হাতে নিয়ে ওরা স্টেশনের রাস্তা ধরল। রোদের মধ্যে গরম ধুলোর ওপর দিয়ে ওরা দৌড়তে লাগল। দেখতে দেখতে তিন-চার ক্রোশ পথ পার হয়ে গেল।

আরও কিছুদূর যাবার পর রাস্তার ধারে এক বটগাছের তলায় একজন যুবক ও যুবতীকে বসে থাকতে দেখা গেল।

জগন্নার রোগা পটকা চেহারা, তাই সে জোরে জোরে হাঁটতে পারত। কিন্তু যুবতীটি মোটা, তাই তার পক্ষে বেশী জোরে হাঁটা সম্ভব ছিল না। একে মেয়েমানুষ তার ওপর মোটা, তাই তারা বেশীদূর যেতে পারেনি। তাদের সব সময় ভয় ছিল, এই বুঝি কেউ পেছু নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জোরে জোরে হাঁটতে পারে নি, মাঝে মাঝে দম নিতে হচ্ছিল বলে এখনও পথটুকু পার হতে পারে নি।

আনংদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভাল করে নজর করে দেখে সঙ্গের ছেলেটিকে বলল, "জগন্নার মতই মনে হচ্ছে, লাল পাগড়ি তো জগন্নারই মনে হয়। কিন্তু এখন উপায়? আমাদের দেখলেই তো পালাবে।"

ছোকরা বলল, "পালাতে দিন-না। খরগোশের মত এক দৌড়ে ধরে ফেলব।"

"ধরে ফেলবে?"

"হ্যাঁ, আর ও দৌড়ে পালালেও মেয়েমানুষটা তো আছে।"

"আরে ওটাকে নিয়ে কি কেটে খাবে? জগন্নাকে দরকার।"

"ওই বা যাবে কোথায়? চলো, নীচের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যাই।"

ছোকরাদের চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে ওরা ওই যুগলকে ঘিরে ফেলে পা টিপে টিপে এগুতে লাগল।

জগন্না বার বার সূর্যের দিকে তাকায় আর বলে, "তাড়াতাড়ি চলো, ট্রেন ছেড়ে দেবে।"

মেয়েমানুষটি ক্রমাগত পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে সে বলে, "একটু দাঁড়াও, নয় তো আমি মরে যাব।"

জগন্না একটু অপেক্ষা করার পর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকায়। এমন সময় দশ-পনেরো হাত দূরে আনংদাকে দেখতে পেয়ে জগন্না যুবতীর হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "আরে পালাও, পালাও, আমাদের ধরবার জন্য লোক আসছে।"

প্রাণ তুচ্ছ করে জগন্না আর যুবতী হাত ধরাধরি করে দৌড় লাগায়। আনংদা পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাতে লাগে 'জগন্না থামো, পালিয়ো না।'

কিন্তু জগন্না বা যুবতী কারোরই তখন বাহ্যজ্ঞান নেই। তারা তখন ভাল রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নীচু রাস্তা ধরে দৌড়চ্ছে। হাওয়ায় যুবতীর কাপড় উড়ছে। জগন্নার পাগড়িও হাওয়ায় উড়তে লেগেছে। পাথর, কাঁকর, নুড়ি, গর্ত সব-কিছু অগ্রাহ্য করে আনংদাও ওদের পিছনে ছুটতে থাকে।

ছুটতে ছুটতে যুবতীর দম ফুরিয়ে এল। সে কালো মাটির ওপর পড়ে গেল। জগন্না তাকে ওঠাতে গিয়ে পিছন ফিরে দেখল ছেলেরা একেবারে কাছে এসে গেছে। তখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মেয়েমানুষটিকে ফেলে সে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল।

মেয়েমানুষটির কাছে এসে ছোকরারা একটু থমকে দাঁড়াল। আনংদা জগন্নার পেছু পেছু তখনও ছুটছে। অনেকক্ষণ ধরে দৌড়াদৌড়ি চলল। কিন্তু যুবক জগন্নাকে আনংদা ধরতে পারল না। তখন উপায় না দেখে আনংদা হাতের কুড়ালটা ছুঁড়ে জগন্নাকে মারল। ছুটন্ত হরিণ যেমন আঘাত খেয়ে পড়ে যায়

তেমনি করে জগন্নার দেহটা লুটিয়ে পড়ল। দৌড়তে দৌড়তে দম ফুরিয়ে আসা জগন্না আহত পশুর মত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

তারপর আনংদা দুজনকে গাড়িতে বশ্বিয়ে ওয়াংগী গাঁয়ে নিয়ে এল। গায়ের থেকে অঝোরে রক্ত পড়ার জন্য জগন্না হলুদ হয়ে গেছে। যুবতীটিও মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

আনংদা বলল, "এই নিন আপনাদের মেয়ে। এই হচ্ছে আপনাদের ছেলে। আমি নিজের হাতে ওকে মেরেছি। যতটুকু প্রাণ ওর এখন অবশিষ্ট আছে আপনারা নিতে পারেন।"

জগন্নার কোন জ্ঞান ছিল না। ওর জামাকাপড় রক্তে ভরে গেছে। ওখানকার লোকেরা মেয়েমানুষটিকে লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে ঘরে নিয়ে গিয়ে আনংদাকে বলল, "নিয়ে যা, একে তোদের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মার।"

জগন্নাকে নিয়ে আনংদা গ্রামে ফিরে এল। নানান রকম গাছ, লতাপাতা বেটে ওষুধ করে আনংদা জগন্নার ক্ষতে দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলল। ওয়াংগী গাঁয়ের লোকেরা বিধবা বউটির সুন্দর নাকটা কেটে গাঁয়ের থেকে তাড়িয়ে দিল। নাকে পট্টি বাঁধা অবস্থায় যুবতীটি জগন্নার ঘরে এসে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ওকে রামোশী মহল্লায় থাকতে দিতে কেউ রাজি ছিল না। তাই একদিন সকালে বউটি কোথায় যেন চলে গেল। তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায় নি।

সতেরো

জুন মাস এসে গেল। মৃগ ঋতুর বর্ষা আসবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু এই ঋতুতে বর্ষা কখনও কখনও সব জায়গায় ঠিকমত হয় না। এইবার এই বর্ষায় মেষপালকদের জমিতে খুব বেশী বৃষ্টি হল না।

প্রত্যেক বছর কিছু-না-কিছু বৃষ্টি হয়, কিন্তু এ-বছর তা আর হল না। চারিদিক শুকনো দেখাচ্ছে। জংগলে ঘুরে ঘুরে কিছু না পেয়ে ভেড়াগুলি খালি পেটে ফিরে আসছে। ফসলের মরসুমে তোলা শুকনো পাতা, শুকনো ভুসি প্রভৃতি আজেবাজে জিনিস দিয়ে তাদের পেট ভরানো হচ্ছে। কবে বর্ষা হবে, চারিদিকে সবুজের সমারোহ চোখে পড়বে— মেষপালকরা সেইদিকে চেয়ে বসে রইল।

এমনি দিনে একদিন শেষ রাতে মুখিয়াজী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখল। কোমরে নিমগাছের ছাল পরা এলোচুল মাথায় সিঁদুর দেওয়া এক স্ত্রীলোক এলো। সে এসে বলল, "আমি তোকে নেবার জন্য এসেছি।"

বুড়ো ভয় পেয়ে বললে, "কোথায়?"

স্ত্রীলোকটি বলল, "ভগবানের ঘরে, প্রস্তুত হও, কালকেই যেতে হবে।" মুখিয়াজী লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসল। ঘামে তখন তার সারা শরীর ভিজে গেছে।

খুব সকালবেলায় আমি তখন ভাল করে উঠি নি, মুখিয়াজী আমার কাছে এসে হাজির। বিছানার কোলে বসে সে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মুখিয়াজী বললে, "আজই শেষ প্রণাম মাস্টার, আমি চললাম।" যখন থেকে আমি এ গাঁয়ে এসেছি একদিনের জন্যও বুড়োকে কোথাও যেতে দেখিনি। বললাম, "যাচ্ছেন কোথায়? কবে আসবেন?" বুড়ো বলল, "এবার চললাম, ফিরে আসব না কোনদিন।"

"তার মানে?"

"কালকে সকালেই আমি মরে যাব।"

এটা ঠাট্টা নয়, বুড়ো খুব গম্ভীর হয়েই এ কথা বলেছিল। আমি যখন হেসে মজা করতে গেলাম তখন সে তার ভোরবেলার স্বপ্নের কথা আমাকে শোনাতেই বললাম, "মুখিয়াজী, আপনি পাগল হননি তো? স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়?"

"সত্যি হয় বাবা, আমার হয়েছে—"

"বাজে কথা। আপনি বেকার সব আজেবাজে কথা ভাবছেন। আপনার মনটা একেবারে শিশুদের মত। সমঝদার লোক হয়ে আপনি যদি এমন করেন, তবে কি করে কাজ চলে।"

বুড়ো এমন করে সব কথাবার্তা বলছিল যেন তার জীবনের অন্তিম সময় একদম কাছে এসে গেছে। কিন্তু আমি তার এই সব অলৌকিক কথা মানতে পারিনি। সব শেষে সে বলল, "আমি আমার সব কিছু অঞ্জীকে দিয়ে যেতে চাই আর ওকে শেকুর কাছে রেখে যেতে চাই, সেই ওকে দেখাশুনা করবে, ওর বিয়ে দেবে। আপনিও একটু দেখবেন অঞ্জীকে।" এই বলে সে বাইরে চলে গেল।

সারাদিন ঘুরে মুখিয়াজী এই স্বপ্নের কথা সবার কাছে বলেছে। সবার কাছে বিদায় চেয়ে শেষ দেখা করে এসেছে। তার এই পাগলামিতে কে বিশ্বাস করবে? অনেকে তার সাথে হাসি-তামাশাও করেছে। বুড়োর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এত যে বোকা শেকু সেও বললে, "দাদু, মরার মত তোমার এমন কোন কপাল খারাপ হয়নি। এখনও পাঁচ বছর বাঁচবে, তুমি যাও ঘরে যাও।"

যে যাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক, মুখিয়াজী সারাদিন ধরে সবার সাথে দেখা করে যাদের স্নেহ করত, ভালোবাসত, সবাইকে শেষ দেখা দেখে, কথা বলে ও শুনে এসেছে।

সন্ধ্যাবেলা যখন ভেড়ারা সব ঘরে ফিরছে তখন একজন এসে আমাকে বলল, "মাস্টার চলুন, মুখিয়াজীর পায়খানা ও বমি হচ্ছে।"

দৌড়তে দৌড়তে আমি এলাম, বুড়োর অবস্থা একেবারে কাহিল, চোখ বন্ধ, মুখ শুকিয়ে গেছে, কথাও বলতে পারছে না।

আমি কাছে যেতেই সে খুব কষ্ট করে বলে উঠল, "মিথ্যা কথা নয় বাবা, আমাকে ডাকছে উপর থেকে।"

আমি ধমকে বলে উঠলাম, "কেউ ডাকছে না, কাল সকালেই আপনি ভাল হয়ে যাবেন।" ঘরোয়া চিকিৎসা শুরু করা হল। এটা সেটা নানা রকম ঔষধ দেওয়া হল। কিন্তু সবার চেষ্টা ব্যর্থ করে আমার একমাত্র ভরসা মুখিয়াজীর অবস্থা মধ্যরাত্রিতে খুবই খারাপের দিকে গেল।

শেকু, অঞ্জু কাঁদতে শুরু করে দিল। সবাই আশা ছেড়ে দিল। বুড়োর আত্মীয়দের চোখও জলে ভরে এল। এইসব দেখে কান্না শুনে

মুখিয়াজী কোনক্রমে বলল, "আরে তোমরা কাঁদছ কেন? আমার বাঁচার কোন ইচ্ছে নেই। এতবড় সরকার সেও আমাকে "কি প্যাটেল, ভালো তো" বলেছে। আমার পিঠে হাত রেখেছে। আমাকে এত ইজ্জত দিয়েছে রাজা সাহেব। এত সম্মানের পর আমার আর বাঁচার কি দরকার?" সূর্য উঠল আর মুখিয়াজীর মৃত্যু হল— এক বুড়ো চলে গেল আর সমস্ত গাঁ শূন্য দেখাতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল— আমার পিছনে আর কেউ নেই। ঐ পাঠশালা ঐ আখড়ার প্রতি আমার যেন আর আকর্ষণ রইল না।

এবার বাড়ী গিয়ে আমি অনেকদিন পাঠশালায় গেলাম না।

আঠারো

একবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শেকুর আধ হাত লম্বা বউ আমার কাছে এসে উপস্থিত হল। তখন আমি পড়ছিলাম। শেকুর বউ এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, বলে উঠল, "কি করছেন মাস্টার মশাই।" বললাম, "কিছু না, এক্ষুণি খেয়ে উঠলাম। বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?" সঙ্গে করে সে সেরখানেক বাদাম এনেছিল, বলল, "বাদাম খান। আমার দেবার মত আর কি আছে।" "কিন্তু মাস্টারকে যে কিছু দিতেই হবে তার কি মানে আছে। বসুন এখানে।" তবুও সে বসল না। মনে হল সে কিছু বলতে চায়

আমি তা বুঝে গেলাম। বুড়ো মরবার সময় অঞ্জীকে শেকুর কাছে রেখে গেছিল। অঞ্জীকে বিয়ে দিতে বলেছিল। অঞ্জী তখন থেকেই শেকুর ওখানে থাকে। ওর ঘরে থেকে অঞ্জী ওকেই ফাঁসিয়ে দিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের শেকু অঞ্জীর জন্য পাগল হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল এসব গুজব আমার কানে একটু একটু এসেছিল, কিন্তু আমি সে সব কথা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এই মেয়েলোকটি যখন তার স্বামীর কথা নিজেই বলছে তখন বিশ্বাস না করেও উপায় কি? শেকুর বউ চুপচাপ বসে রইল এজন্য আমারও কিছু অস্বস্তি লাগছিল। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। শেষে বললাম, "চাষবাস কেমন চলছে?" দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা টান টান করে আঁচলে হাত দিয়ে বসে সে বলল, "আমার স্বামীর কি করি বলুন তো?" বললাম, "কেন কেন, কি হয়েছে।" আমি যে প্রায় সব জানি এটা ও জানলে কি আর এত সব কথা বলতে পারত। অন্তত এটা ভেবে ও আশ্বস্ত হবে যে এখনও কথাটা চারিদিকে প্রচার হয়নি। সে চোখ নিচু করে বলল, "আমার ঘরে খুব অশান্তি চলছে। কিন্তু ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাজে ব্যবহার কি ঠিক?" মিথ্যা আশ্চর্যের ভান করে বললাম, "কিছু শুনেছ নাকি?" "তবে না তো কি? আবার বিয়ে করতে চায়।" বললাম, "কি বলছ তুমি? শেকু আবার বিয়ে করতে চায়? একা একা ও ভেবেছে কি?"

"একা কোথায়? মুখিয়াজী মরে গেল, বেচারা বড় ভালো ছিল। কিন্তু মরার পর সে আমার সংসারে আগুন লাগিয়ে গেল।" শেকুর বউয়ের বোধহয় গলা ধরে গেল, চোখে জলে ভর্তি হয়ে গেল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে কান্না-কান্না গলায় পরিষ্কার

করে বলল, "সবসময় অঞ্জীর পিছনে পিছনে ঘোরে। জোয়ান ছেলেদের মত সবসময় ওর সঙ্গে থাকে। এসব দেখে আমি কি করে চুপ করে থাকি?" বললাম, "মেয়েটা নাহয় কিছু বোঝে-সোঝে না। এখন ন-হাতি ধুতি পরে; লজ্জা শরম হয় নি। কিন্তু ও কেন ওর পিছনে পাগলের মত ঘুরবে?" আপনার সামনে কি আর বলব? জানের জন্য লজ্জা না থাকলেও মনের জন্য তো লজ্জা থাকে মানুষের। আপনি এখন কি বলবেন বলুন। বুড়ো মেয়েটাকে সামলানোর জন্য আমাদের কাছে রেখে গেল। ভাল ছেলে দেখে মেয়েটার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বাহবা নেওয়া উচিত ছিল, তা না করে ওর সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। কাজ-কর্ম কিছু করে না। কেবল বলে শাড়ী আনো, চোলী আনো। আপনিই বলুন এটা কি ঠিক।"

তখন মিথ্যা আশ্চর্যের ভান দেখিয়ে মিথ্যা রাগের ভান করে বললাম, "এ কথা আপনি নিজে বলছেন তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। কিন্তু শেকু তো সাত চড়ে মুখে একটা রা কাড়ে না। এরকম কাজ ও করতে পারে না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন সত্যি বলে মানতে হবে।" "আমি মিথ্যা বলব কেন। এতে কি কেবল আমার স্বামীরই একলা ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে? আমার নিজের হচ্ছে না? নিজের ঘরের কথা কেউ কি সহজে বাহিরে বলে?" "ছিঃ ছিঃ! শেকু কিন্তু বোকার মত কাজ করেছে। এতদিনের সুনাম নষ্ট করে ফেলেছে।"

আমার এ কথায় সে ভাবল তার স্বামীর খুব বদনাম হচ্ছে। তাই সে কষ্ট করে বুঝিয়ে বলল, "না—না, মেয়েটাকে ও খালি খালি নষ্ট করতে চায় না। সে তাকে বিয়ে করবে বলেছে।"

"কোন আক্কেলে বিয়ে করবে? আর বিয়ে করার কি দরকারটা ওর?"

"আমি সন্তানহীনা, তাই বাচ্চার জন্য বিয়ে করতে চায়।" আমি চুপ করে রইলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শেকুর বউ আমি যা বলতে চাই তাই বলেছিল— "বাচ্চা নেই তো ঠিক আছে। কোন জমিদারী তো আর নষ্ট হচ্ছে না, যে উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন আছে? নিজেদের কপালে থাকলে ভগবানই সন্তান দেবেন! কি বলুন, তাই না?"

আমি বললাম, "তাহলে কোন মেয়ে দেখে ভালভাবে বিয়ে দিয়ে দাও।" "কিসের জন্য? দুজনেই তো ভাল করে খেতে পারি না। আপনি দেখেন না কিভাবে চলছে? আর একজন নতুন আসলেই কি আমাদের পেট ভরবে? ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকে তবে শুকনো গাছেই ফল ফলতে পারে।"

আমি সব শুনছিলাম, মাঝে মাঝে কথা বলছিলাম, আর এই অশিক্ষিত মহিলা, যার কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ, আমার সামনে বসে কথা বলছিল।

স্বামীর সঙ্গে মাঠে ক্ষেতে কাজ করা এই মেয়েলোকটি স্বামীর এই ব্যবহারে কি ভীষণ বিপদে পড়েছে! আবার ঐ অঞ্জীর চুলের মুঠি ধরে তাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সে সব কোনকিছু না করে এই মেয়েলোকটি একজন মাস্টারের কাছে তার দুঃখের কথা শোনাচ্ছে। তার চোখ বার বার জলে ভরে আসছিল, ঠোঁট কাঁপছিল, আমার মনে যে-সব ভাবনা জাগছিল, এই সাধারণ মহিলার মনেও নিশ্চয় সে-সব ভাবনা জাগছে। দোষ অঞ্জীরও নয়। সে এখন যৌবনে পা

দিয়েছে ; ভাল, মন্দ কোনকিছুর বিচারশক্তি তার নেই। কিন্তু শেকুকে যতই বলা হচ্ছে সে ততই অঞ্জীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। অঞ্জী ও শেকুর মধ্যে এইরকম ভাব-ভালবাসার ব্যাপারটা এমনই ছিল যা কোনরকমেই বন্ধ করা যাবে না ব'লে হতভাগী স্ত্রীর মনে হয়েছিল, নয়তো এক অপরিচিত পুরুষের সামনে এসে সে নিজের মনের কথা এভাবে খুলে বলত না।

আমি বার বার বলছি যে "শেকুর এরকম করা কোনমতেই উচিত নয়। ওকে বোঝানো উচিত।"

শেকুর স্ত্রী বলছে, "মাস্টার, আমি আপনার কাছে এসেছি এইজন্য যে আপনি গাঁয়ের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক, সরকার প্রত্যেকেই আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আপনি ওকে একটু সাবধান করে দিন। যদি শোনে আপনার কথাই শুনবে।"

"কিন্তু এ তো তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, আমি বললে শেকু যদি বলে আপনি কে আমাদের ঘরের ব্যাপারে কথা বলার ? তখন আমার সম্মান কোথায় থাকবে ?"

আমার কথা শুনে হাত মটকে সে বলল, "ও আবার কি বলবে ? হাতে হাতকড়ি পড়বে না ওর, ভাল করেই ও তা জানে।"

এইরকম কথাবার্তার পর পাঠশালার ঘণ্টা পড়ল। আয়বু সদা আর সেই ছোকরা চলে এলে শেকুর বউ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা চলি।"

সে চলে গেল, বাদামগুলি ওখানে পড়েছিল। বাদামগুলির দিকে তাকিয়ে আয়বু বলল, "দিদিমা কি বাদাম নিয়ে এসেছিল মাস্টারমশাই ?"

"হ্যাঁ, কেন রে?" "কিছু না। কোনদিন আসেনি, তাই আজ কেন এসেছিল তাই আমি ভাবছি?" আয়বু শুধু এটুকুই বলল, কিন্তু ও কি বলতে চায় সে আমি বুঝে গেলাম। বাদামগুলো তুলে রাখলাম। দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আমি পাঠশালার দিকে চললাম।

আমার মনে হচ্ছিল আয়বু হয়তো এসব ব্যাপার কিছুই জানে না। সে হয়তো সহজভাবেই আমাকে মহিলার কথা জিজ্ঞাসা করছে। এরপর আসা-যাওয়ার পথে দু-চার বার শেকুর সাথে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু আগের মত আর আমাকে দেখে হাসে না বা বলেও না— কি মাস্টারমশাই কি খবর?

দূর থেকে আমাকে দেখলেই মাথা নিচু করে সে দ্রুত সরে যায়। সব কিছু জানার পর ওর ওই শুষ্ক আচরণের কারণ ওকে জিজ্ঞাসা করতে আর আমার সাহস হয়নি।

অঞ্জী ও শেকুকে নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে কানাকানি আরও বেড়ে গেল। লোকে বলাবলি করে রোজ ওরা একসাথে ছাগল চরাতে যায়। রাস্তায় চলতে চলতে অঞ্জী শেকুর গায়ের সাথে গা লাগিয়ে চলে।

আজ ওদের দুজনকে কেউ জংগলের ঐ দূরে দেখত, কাল কেউ আবার মাউলি মার মন্দিরের কাছে দেখতে পেত, সেখানে অঞ্জী মাউলি মার আঁচল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে কোনদিন শেকুর সাথে ঝগড়া করবে না। পরশু দিন শেকু ছাগল বেচে অঞ্জীর জন্য তোড়া বানাতে দিয়েছে। এরকম অনেক কথা ওদের দুজনকে নিয়ে সারা গাঁয়ে শোনা যেতে লাগল।

শেকুর ঐ প্রেমে পড়ার ঘটনা জোয়ান ছেলেদের কাছে এক

মহান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর বড়োদের কাছে হয়েছিল তিরস্কারের বিষয়।

আবার একদিন শেকুর সাথে ওর বউয়ের খুব ঝগড়া হ'ল। কি হয়েছিল তা জানা যায়নি। কারণ মধ্যরাত্রেই তাদের ঝগড়া হয়েছিল, আর সকালবেলা ওর স্ত্রী বাড়ী থেকে চলে গিয়ে আলাদা হয়ে বাস করতে লাগল।

ধুলা মেষপালকের ঘরের পাশে একটা ছোট ঝোপড়ি মত ছিল সেখানে সে উনুন তৈরী করে থাকতে লাগল। চাষ-বাসের প্রতি কোন নজর না দিয়ে, মজুরি খেটে সে নিজের পেট চালাতে থাকে। সে শেকুর নাম মুখে আনা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়।

অঞ্জী আর শেকু একসঙ্গে থাকতে লাগল। শেকু অঞ্জীকে বিয়ে করার জন্য সব ব্যবস্থা করতে লাগল। ভেড়া ছাগল সব বিক্রি করে দিয়ে শেকু নগদ পয়সা জমায়। এমন-কি তরিতরকারিও যা ছিল বিক্রি করে দেয়। শেকুর ক্ষেত গাঁয়ের থেকে একটু দূরে, সেই ক্ষেতের পাশে অন্য একটা বড় বাগান ছিল যেটা এরোশী গাঁয়ের। বনগরওয়াড়ীর পাশেই সে গ্রাম। এই বাগানে সারের জন্য অনেক ভেড়া এনে রাখা হয়েছে।

বাগানের মালিক অন্য গাঁ থেকে মেষপালক ডেকে এনেছিল বাগান পাহারা দেবার জন্য। দু-তিনজন জোয়ান মেষপালক রাত-ভোর ভজন গাইত। পাতা জ্বালিয়ে তারা শরীর গরম রাখত। সেই গানের সুর অঞ্জী তার ক্ষেতের থেকে শুনতে পেত।

একদিন দুপুরবেলা ঐ জোয়ান মেষপালকদের একজন বাগানের সীমানায় লাগানো একটা বাবলা গাছের উপর উঠে গাছের ডাল-পালা কাটছিল। ভেড়াগুলি এসে সেই বাবলা গাছের তলায়

জমা হয়েছে, তারা কাঁটা বাচিয়ে পাতা খেতে শুরু করেছে। বাবলা গাছে সবুজ সাদা ফুলগুলি তারা চিবোচ্ছিল।

অঞ্জী তাড়াতাড়ি এখানে এসে নিচে দাঁড়িয়ে গাছের উপর চড়া জোয়ান মেষপালককে বললে, "এই তুমি কে যে বাবলা গাছ কাটছ?" উপরে বসা জোয়ান ছেলেটা নিচের দিকে দেখে বলল, "কেন হে, তোমার কি কোন দরকার আছে?" জোয়ান ছেলেটির "কেন হে" কথাটায় অঞ্জীর মনে রোমান্স জাগায়। তখনও ছেলেটি অঞ্জীর গায়ের ওপর সবুজ হলদে ফুলগুলি টপাটপ ফেলতে ফেলতে নিচে লাফিয়ে পড়ে। কালো, লম্বা-চওড়া সুন্দর নাক-চোখের অধিকারী সেই ছেলেটা অঞ্জীর সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটির চোখের ওপর চোখ রেখে তাকাবার সাহস অঞ্জুর হল না।

ওর বুকে ধুকধুকানি শুরু হয়ে গেল। আশেপাশে কেউ ছিল না। বাবলার ছায়ায় ভেড়াগুলি চরে বেড়াচ্ছিল। আর ঐ মস্তান ছেলেটি হাসতে হাসতে অঞ্জীর একদম সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "অতিথি মানুষকে এমন করে কথা শোনাতে নেই, এই ক্ষেত কি তোমার?"

অঞ্জী নিচের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জবাব দিল, "নিজের না হলে কি আর বলছি?"

মেষপালকটি বললে, "এত সুন্দর ফুলে ভরা গাছটা দেখে আমার কাটতে ইচ্ছা করল।" আর সে খপ করে অঞ্জীর হাত চেপে ধরল। অঞ্জী চেঁচাল না, নিজের হাতও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না, ও একটু মাত্র ছটফট করল কিন্তু তাতে করে সে ঐ জোয়ান মেষপালকের কাছ থেকে হাত ছাড়াতে পারল না।

ওর চোখের ওপর চোখ রেখে অঞ্জী বলল, "আমার চুড়ী ভেঙে গেছে, আমার হাত ছেড়ে দাও।"

"ছাড়ব না, কি করবে?" "এ তো বেশ জুলুম তোমার, ছাড়ো হাত।" তবুও মেষপালক জোয়ানটি হাসতে লাগল। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত সেই জোয়ান মেষপালকটি ভেড়া চড়িয়ে যখন নিজের গাঁয়ে ফিরে গেল, অঞ্জীও চলে গেল। শেকুকে একবার বলেও গেল না।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অঞ্জী অন্য প্রতিজ্ঞা রাখার খোজে চলে গেল। তার দশ-পনেরো দিন বাদে শেকুর বউ আমার কাছে এলো। ওকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। গাজরগুলি মাটিতে রাখতে রাখতে বলল, "মাস্টারমশাই, আমার বুদ্ধ ঘরে এসে গেছে। বাড়ী ফিরে এসেছে।"

উনিশ

মাউলি মার মেলা এসে গেল। প্রত্যেক বছর এই বনগরওয়াড়ীতে এই মেলা, গাঁয়ের থেকে এক মাইল দূরে। একটা ছোট চালা, তার ওপর ছোট একটা ধানের গোলার মত বেদী। বেদীর ওপর মায়ের মূর্তি। তার পাশে একটু জায়গা ছিল আর আশেপাশে একটা-দুটো করীল, আর বাবলা গাছ আর দু-একটা শুকনো গাছ ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

মেষপালকদের খুব জাগ্রত দেবী ইনি। ইনি তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন বলে এখানকার সবারই বিশ্বাস।

গাঁয়ের লোক কেন এতদিন মায়ের জন্য মন্দির করেনি তার এক কারণ আছে। তারা মন্দির বানাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মার মন্দিরের পূজারীকে মা স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে "মন্দির কোরো না। আমি যেখানে আছি আনন্দেই আছি।"

ভালো ভালো কাপড়চোপর পরে সবাই সেই নির্জন স্থানে এসে জমা হয়েছে। আশেপাশের গাঁ থেকে দু-চার জন ভক্ত এসেছেন, একশো দেড়শো লোক জমা হয়েছে।

পূজারী পূজা শুরু করেছেন, সকলের কপালে আবীর দেওয়া হয়েছে। গাঁয়ের বিরুদ্ধে যাওয়া বালা মেষপালক ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে মেলায় পূজা দেখতে এসেছে, ওকে দেখেই ওখানকার সবার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। "ওকে থামাও", "ওকে দেবীর কাছে যেতে দিয়ো না" প্রভৃতি আওয়াজ উঠল কিন্তু কোন কিছু পরোয়া না করে বালা দেবীর কাছে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে আবীর মাথায় লাগাবার জন্য পূজারীর কাছে নিজের মাথা পাতলো, তখন পূজারী বলল, "তুমি গাঁয়ের সমাজ মানো না, তোমাকে আবীর দেব না।"

এত লোকের মাঝে পূজারী তাকে প্রসাদীর আবীর না দেওয়াতে বালার যেন মনে হল তার মাথা কেটে গেল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে সবার মুখের দিকে চাইতে লাগল। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না। কুষ্ঠ রোগীর মত সবাই ওর স্পর্শ বাঁচিয়ে রইল। গত কয়েক মাস ধরে ওর অনেক কষ্ট গেছে, কোন লোকই ওর সঙ্গে কথা বলত না। আজ ওর চরম শাস্তি হয়েছে।

দেবীর প্রসাদ পর্যন্ত সে পায়নি। লোকের কথায় যে বালা কোনদিন ভয় পায়নি আজ সে এই উপেক্ষায় খুব ভয় পেয়ে গেল। ধুতির কোঁচা ঝট করে খুলে সবার সামনে বিছিয়ে চীৎকার করে সে বলল, "গাঁয়ের সামনে আমি আমার কাপড় পাতলাম, আমার দোষ মাপ করো। আমাকে তোমাদের মধ্যে নিয়ে নাও। আমার মুখে আবীর দাও। আমার গাছগাছালি নিয়ে নাও। আমার বাড়ীঘর নিয়ে নাও, আমার জীবন নিয়ে নাও, আমাকে দূরে ঠেলে ফেলো না।"

আর ওর কঠোর স্বর কাঁপতে থাকে; চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। এত বড় জনতা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে চুপ করে যায়।

তখন রামার বুড়ো বাবা লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, "বাচ্চা ছেলে যদি কোলে প্রস্রাব করে দেয় তবে কি তাকে কেটে ফেলবে? ওকে ফাগ লাগাও।"

লোকেরা ফুসফুস করে সবাই এক সাথে বলে উঠল, "দাও।"

তখন পূজারী উঠে গাঁয়ের লোকের সামনে কাপড় ফেলে দাঁড়ানো বালার মাথায় আবীর দিতে দিতে বলে উঠল, "জয় মাউলি মার জয়।" লোকেরা জয় জয় বলে চীৎকার করল। আবীর ছড়ালো। মুঠি মুঠি করে ছড়িয়ে দিল। লুট দিল। সেই সব প্রসাদ খোঁজার জন্য মাথা নিচু করে মাটিতে সবাই ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিল।

বাজনাদাররা জোরে বাজনা বাজাতে শুরু করল, ঢোলওয়ালা জোরে জোরে ঢোল বাজাতে লাগল, শানাই শুরু হয়ে গেল; আর অন্য বারের মতই ধুল্যা মেষপালকের শরীরে মাউলি মা

ভর করল। হুঁ…হাঁ…করে গুঞ্জন শুরু করল। সারা শরীর দুমড়ে উঠল। বাজনাওয়ালা আরো জোরে বাজনা বাজাতে লেগে গেল আর তার তালে তালে ধুলা জোরে জোরে নাচতে লাগল। সে গা থেকে কম্বল ফেলে দিল। মাথার উপর থেকে পাগড়ি তুলে ফেলল।

আধা উলঙ্গ ধুলা মেষপালক দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। পূজারী তার মাথায় ফাগ ছড়িয়ে দিল।

কালো চুলের মধ্যে লাল আবীর গুলে দেওয়া হ'ল। সেই গোলা আবীর নাকের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু ধুলার খেয়াল নেই। নেচেই চলেছে।

"মা এসে গেছে। মা এসে গেছে।" বলতে বলতে সব মেষপালকরা ধুলার চারিদিকে জমা হয়ে গেল।

শেকু প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, "মা, এ বছর বর্ষা হ'ল না, আমাদের কি অপরাধ হ'ল?"

মা মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, "খুব পাপ বেড়ে গেছে। গাঁয়ে খুব নোংরামি চলছে রে। এইজন্যই বৃষ্টি হয়নি।"

"বর্ষা চলে গেলে ভেড়া কী খাবে? আমরা বাঁচব কি করে মা?"

চোখ বন্ধ করে মা বলল, "আমার মেলা ঠিক করে করো—আমাকে ভাল করে নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তা হলে বৃষ্টি হবে?"

"হ্যাঁ, হবে।"

"কিন্তু মা, কবে হবে? মৃগ ঋতুর বর্ষার সময় এসে গেছে।

সারা দুনিয়ায় বৃষ্টি হচ্ছে আর আমাদের এই গাঁয়ে আকাশে একফোঁটা কালো মেঘও দেখা যাচ্ছে না।”

“আরে এখন বর্ষা হবে, এই নক্ষত্রেই বৃষ্টি হবে।”

শেকু নিজের গালে হাত দিয়ে বলল, “মা, অন্যায় মাপ করো। তোমার মেলা ঠিক করে করব। তোমার পূজার নৈবেদ্য ভাল করে দেব। সব কিছু আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি।”

আর তখন ধুলা মেষপালকের শরীর থেকে মা বিদায় নিলেন আর ধুলা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

লোকেরা আবার মেলা করল। প্রত্যেক বছরের মত মার কাছে পাঁঠা বলি দেওয়া হল। আয়বু বলি দিল আর শেকু সেই বলির রক্ত মার কাছে দিল। সেই বলির পাঁঠা কেটে মায়ের সামনে রাখা হল। চারিদিকে লোক জমা হয়ে গেল। বাচ্চারা ভীড় করে সব দেখতে লাগল, তখন আয়বু সবাইকে ধমক দিয়ে বলল, “তোমরা এখন যার যার ঘরে চলে যাও, ঘর থেকে রুটি নিয়ে এখানে খেতে এসো। তোমরা সব বাড়ি থেকে রুটি নিয়ে এখানে চলে এসো। এখানে তোমাদের মাংস দেওয়া হবে। বনগরওয়াড়ী তোমাদের মাংস দিতে পারে—জোয়ার কোথায় পাবে?”

ধীরে ধীরে লোকেরা চলে গেল, কিছু কিছু লোক রয়ে গেল। তারা বড় গর্ত করে আগুন জ্বালাল। তারপর হাঁড়ি করে দু-তিনটে পাঁঠার মাংস রান্নায় বসানো হ’ল। মাংসের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

আকাশে চাঁদ উঠল; মশাল জ্বালানো হ’ল। লোকেরা এক এক করে থালায় রুটি নিয়ে আসতে শুরু করেছে। সবাইকে গরম গরম আর ঝাল ঝাল মাংস দেওয়া হল।

সবাই মাউলি মার জয় জয়কার করে উঠল। হাত চালাতে লাগল। আর চটপট খেতে লাগল।

সেই ঝাল আর গরম মাংসে সবার মুখ প্রায় জ্বলে যেতে লাগল। ঝালের চোটে নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কুড়ি

মাউলি মা অভয় বাণী দিয়েছেন কিন্তু নক্ষত্রের পর নক্ষত্র চলে গেল, তবুও বনগরওয়াড়ীতে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হ'ল না। গরম মাটি ঠাণ্ডা হ'ল না। গাছপালা প্রায় সব শুকিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত ভেড়াগুলি মাঠে ঘাটে তন্নতন্ন করে ঘাস গাছপালা খুঁজতে লাগল। ধুলা মাটি সব রম হয়ে গেল। কুয়ার জল শুকিয়ে গেল।

সকালে ছুপুরে কুয়ার পারে লোকেদের ভীড় হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা পাখিদের জন্য কুয়ার কাছে একটুও জল পড়ে থাকত না। সারা রাতের অবসরে কুয়ার মধ্যে যেটুকু জল জমা হত সেই জল আগে নেবার জন্য লোকেরা খুব ভোরবেলা ওখানে গিয়ে হাজির হ'ত। আর এই জলের জন্য ঝগড়া করত।

জন্তু-জানোয়ারগুলো রোগা হয়ে যেতে লাগল। ওদের হাড়-গোড় বেরিয়ে গেল। তাদের শরীরের লম্বা লম্বা ভল্লুকের মত লোমগুলি বেড়ে যাওয়ার জন্য তাদের খুব ময়লা দেখা যেতে লাগল।

লোম কাটার জন্য ভেড়াগুলিকে আরও রোগা দেখাতে লাগল। তাদের চর্বি একেবারেই শুকিয়ে গেল। পাহাড়ের পুরনো ঘাস গাছগাছালি জোগাড় করে নিয়ে এসে লোকে ভেড়াদের সামনে রাখতে লাগল। কিন্তু জলের জন্য ভেড়াদের অনেক দূর দূর জায়গায় নিয়ে যেতে হত।

কাক, চড়াই হোলে পাখিদের বেশী চোখে পড়ছে না। যে ইঁদুরগুলি ক্ষেতের ফসল নষ্ট করত তারা ক্ষিদের চোটে গ্রামে ঢুকে পড়ে মেষপালকদের কম্বল কাটতে লাগল। মিষ্টি গন্ধের জন্য ছাকনির তার কাটতে লাগল। ঝুড়ির বেত কাটতে লাগল।

লোকেদের চেহারার মধ্যে কান্তি নষ্ট হতে লাগল। তাদের চোখে ক্ষুধা দেখা যেতে আরম্ভ হয়েছে। সঞ্চিত ফসল কমে যাওয়াতে লোকেরা পয়সা নিয়ে বাজারে যেতে লাগল। খুব বেশী দাম দিয়ে তরিতরকারি কিনতে হল সবাইকে।

যে-সব লোকের পেট রোজ মজুরি খেটে চলত গাঁয়ে তাদের অবস্থা হল সবচেয়ে শোচনীয়।

রামোশীয়াদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। দু-তিনদিন পর্যন্ত তাদের ঘরে উনুন জ্বলত না। আখড়ায় আসা ছেলেরা পেটের দায়ে অন্য গাঁয়ে রুজি রোজগারের জন্য চলে গেছে। আখড়া খালি। পাঠশালারও সেই অবস্থা। কোন ছাত্র আর পাঠশালায় আসছে না। সবাই পেটের চিন্তায় অন্য গ্রামে গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

সারা গাঁয়েই অকাল অবস্থা। বনগরওয়াড়ীতে দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়ে গেল। লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

রামা মেষপালকের চেহারা কালো হয়ে গেছে। তার রোজ

পাঠশালায় আসা বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও বা দু-একদিন মাঝে আসে কিন্তু গাঁয়ের এই দুর্ভিক্ষের কথা ছাড়া কোন কথাই তার সঙ্গে হয় না।

রামা এখন সব সময় এক কথা বলে, "জানেন মাস্টারজী, রাম লক্ষ্মণ ভগবানের নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা দুজন তাঁদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছেন তখন দুপুর হয়ে গেছে, তখন এরা দুই ভাই রামঘাটে গাছের ছায়া দেখে খাবার জন্য বসেছেন ঠিক তখন বৃষ্টি নামল, খুব জোড়ে বৃষ্টি পড়তে লাগল। তাদের খাবারের মধ্যে জল পড়তে লাগল। রাম খুব রেগে গিয়ে এক বাণ মেরে বৃষ্টিকে ঐ পারে পাঠিয়ে দিলেন। তখন থেকে সেই যে জল এখান থেকে চলে গেল আর এলো না। এখন দেখুন, এখন রামঘাটে বৃষ্টি হচ্ছে আর আমাদের মাথার উপর দিয়ে কালো কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। গিয়ে ওই ঘাটে বৃষ্টি দিচ্ছে।" রামা এইসব কাল্পনিক ঘটনা আমাকে শোনাতে লাগল।

খাবার না পাবার জন্য ভেড়ার পাল সব রোগা হয়ে গেল। এই ভেড়া দিয়েই মেষপালকদের জীবিকা একমাত্র ভরসা। দুর্বল হয়ে যাবার দরুন ভেড়াদের মধ্যে নানা রকম রোগের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল।

বসন্ত রোগ ভেড়াদের মধ্যে মহামারী হয়ে দেখা দিল। তার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল যার ফলে ভেড়ার পাল নিজেদের জায়গা থেকে নড়তে চড়তে পারছে না।

করুণ চোখে তারা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ক্ষুধা এবং বসন্তের যন্ত্রণায় কিছু কিছু ভেড়া পাগল হয়ে গেল। তারা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে লাগল। এরকম ঘুরতে ঘুরতে

কিছু মাটিতে পড়ে মরতে লাগল। কারোর আবার পা অচল হয়ে গেল। কোন কোন ভেড়ার নাকের রোগ দেখা দিল। নাক দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাদের কাকেরা ঠোকরাতে লাগল। মেষপালকরা গুলতি দিয়ে সে সব কাকেদের মেরে তাড়াতে লাগল। ভেড়াদের জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। সামান্য খাদ্যও তারা মুখে তুলছে না।

ভেড়াদের গোয়ালে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দেওয়ায় ভেড়াগুলি ঝটপট মরে যেতে আরম্ভ করল।

এই রোগ বিরা মেষপালকের ভেড়াদের ডেরায় দেখা দিল, ভেড়াগুলি বসে বসেই মরে যেতে লাগল।

মাছিদের উপদ্রব বেড়ে গেল। ভেড়াদের ডেরায় রোজ পাঁচ-দশটা করে ভেড়া মরতে লাগল।

বিরার ছেলে সদা রোজ সেই মরা ভেড়াগুলিকে গাঁয়ের বাইরে মাটিতে পোঁতার জন্য নিয়ে যেতে লাগল।

চামড়ার দাম খুব কমে গেল। আশেপাশের চামারেরা দু-চার আনা দিয়ে ছাল কিনে নিয়ে যেতে লাগল। প্রথম দিকে চামাররা সেই সব মরা ভেড়াগুলি নিয়ে যেত, কিন্তু পরের দিকে তাদের ঘেন্না ধরে গেল। চামড়া ছাড়ানো মরা ভেড়াগুলি মাঠে ঘাটে পরে রইল।

কে জানে কোথা থেকে শকুনের দল এসে এখানে ক্রমে ভীড় করেছে। গাঁয়ের কুকুরগুলি প্রথমে তাদের তাড়া করত। কিন্তু এখন কুকুর আর শকুন একই জায়গায় বসে সেই মরা ভেড়াদের মাংস খেতে লাগল। গাঁয়ের ধারে এক বটগাছের ওপর শকুনেরা তাদের বাসা বাঁধতে লাগল।

এইসব মোটা মোটা শকুনেরা সারাদিন ভেড়ার মাংস খেয়ে রাতে গিয়ে বটগাছের উপর উঠত। তাদের বিষ্ঠায় বটগাছের তলা সাদা হয়ে গেল। সাত-আট দিনের মধ্যে বিরা মেষপালকের প্রায় ছয়শো ভেড়া মরে গেল। বিরা তার ভাগ্যের ওপর দোষ দিতে লাগল। এই সব ভেড়াদের দুঃখে বিরা খুব ভেঙে পড়েছে।

সুন্দর সুন্দর ভেড়াগুলিকে মরতে দেখে বিরা চীৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বির'র সব ভেড়াগুলিই মরে গেল। কিন্তু যা হবার তা হলই। বিরা মেষপালকের অন্তরটা ভেঙে যেতে লাগল। তার পুরো গোয়ালটাই যে খালি হয়ে গেল। লোকেরা অনাহারে থাকতে লাগল। যতক্ষণ সম্ভব ছিল ততক্ষণ তারা ঘাস খড় কিনে গরুদের খাওয়াতে লাগল। লোকেরা যতক্ষণ পেরেছে অবলা জীবগুলিকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু এরকম ভাবে আর চাল'নো যাচ্ছে না। করুণ চোখে ওরা বসে আছে। অবলা জীবগুলির দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

রামোশীয়ারা তাদের পুরানো মদ তৈরীর কাজ আরও জোরে করতে লাগল। কিন্তু মদ খাবার লোক পাওয়া যেত না। বউ নিয়ে পালানো জগন্না খিদের জ্বালায় মদ খাওয়া শুরু করল। কিন্তু সেও পেটের দায়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে পাশের গাঁয়ে রোজগারের জন্য গিয়ে পৌঁছল। সেই গাঁয়ের চাষীরা এই সব অভুক্ত লোকদের আগাছা নিড়াবার কাজ দিল।

এই সব আগন্তুক লোকেরা এখন কোথায় চলে যাবে ঠিক নেই। ভেবে এই সব চাষীরা তিন দিনের ভিতর কাজ তুলে দেবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তাদের কাজে নিল। ধুতি ভাল করে কোমরে বেঁধে জগন্না রামোশী তিন দিন কাজ করল।

খিদের জ্বালায় সে ক্ষেতের মধ্যে তিনদিন কোদাল চালিয়েছিল। ঐভাবে কোদাল চালাতে চালাতে জগন্না পড়ে গেল, আর উঠল না।

অনাহারে থাকা দুর্বল বলদটাকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে যাবার সময় শেকুর সাথে আমার দেখা হল। আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছ শেকু?" শেকু দাঁড়িয়ে বলল, "আর পারছি না মাস্টারমশাই, তাই একে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি বেচবার জন্য, অন্তত অন্য জায়গায় গিয়ে দুটো পেট ভরে ঘাস তো পাবে।"

সে বাজারে গেল এবং সন্ধ্যায় ফিরে এল কিন্তু তখনও বলদ তার সঙ্গেই রয়েছে।

তার বউ বলল, "কি হ'ল, বেচলে না?"

শেকু ম্রিয়মাণ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, "কেনবার কোন লোক নেই, কসাই সাত টাকা দাম দিতে চেয়েছিল। কসাই-এর ছুরিতে না মরে আমার দরজার সামনে না খেয়ে মরা এর থেকে ভাল।"

লোকে ভেড়াদের বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে জোয়ার কিনে খেতে লাগল। শুরুর দিকে যারা গেল তারা ভেড়াগুলি বেচতে পারল। কিন্তু পরে যারা গেল তারা খালি হাতে ফিরে এল। কোন বাজারেই এই সব পশুদের কেনার মত গ্রাহক পাওয়া গেল না।

যারা কিনবে তারাই বা এইসব জীবদের কি খাওয়াবে?

অনাহারে শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে আনংদা একদিন এসে বলল, "মাস্টারজী, চললাম বাঁচবার জন্য।"

মাস্টার আর কি উত্তর দেবে? শুধু বললাম, "কি বলছ? কোথায় যাচ্ছ?"

"যেখানে পথ পাব সেখানেই যাব, যেখানে ফসল হচ্ছে, জল আছে সেখানে কাজ করব। যদি বেঁচে থাকি তবে আবার ফিরে আসব।"

একটু গিয়ে আবার থামল আনংদা। বলল, "মাস্টারমশাই, দাত্ব কনফুসকাকে আমি আর আয়বু ছুজনে মিলে মেরেছি। ও আপনাকে খুব বিরক্ত করছিল। এইজন্যই আমরা ওকে মেরেছি।"

"কি বলছ কী?"

"দিব্যি করে বলছি।"

"কিন্তু আয়বু সেই রাত আমার কাছেই তো শুয়ে ছিল।"

"মেরে এসে চুপচাপ শুয়েছিল।"

"হ্যাঁ।"

এই কথা বলে আনংদা চলে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে রামোশীরা তাদের মহল্লা ছেড়ে সব রোজগারের জন্য অন্য গাঁয়ে চলে গেল।

একদিন পঁচিশ জন লোক পিঠের ওপর বস্তা বিছানা নিয়ে বার বার পিছন তাকাতে তাকাতে গাঁ ছেড়ে যেতে লাগল। মেয়ে বুড়ো বাচ্চারাও সাথে সাথে চলল।

বেতুইন যাযাবরের মত এরা রোদে পোড়া রাস্তায় চলতে লাগল। গাঁয়ের রামোশী মহল্লা খালি হয়ে গেল। এক এক করে ভেড়াদের নিয়ে মেষপালকরাও চলতে লাগল। তাদের সাথে পোড়া কুকুরগুলিও চলতে লাগল। নিজেদের জীবনের থেকে প্রিয় ভেড়াগুলিকে অনাহারে মরতে দেখে তাদের প্রাণ ফেটে যেতে লাগল। তাদের সাথে সাথে তাদের বউ বাচ্চারা চলতে শুরু করল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা ছেড়ে তারা অন্নের

সন্ধানে বেড়িয়ে গেল। তাদের সঙ্গে ভেড়ার বাচ্চা, ছাগলের বাচ্চা ব্যাঁ ব্যাঁ করতে করতে অগ্রসর হল।

রামা যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, "মোর্চাপুরের ঐ দিকে যাচ্ছি, আত্মীয়ের বাড়ী। বাবা গেল না, তাকে একটু দেখবেন।"

বুড়ো কাকুবা গেল না, ছেলে অনেক বলা সত্ত্বেও সে গেল না, বলল, "আমি কিসের জন্য যাব? তুমি ভেড়াদের নিয়ে যাও। ওদের বাঁচাতে চেষ্টা করো। আমার আর কি? আমি যদি মরি এখানে মরব। এই বুড়ো বয়সে এত দৌড়ঝাঁপ আমার ভাল লাগে না, তুমি যাও।"

তবুও রামা কিছু আনাজ, জোয়ার রেখে গেল আর বুড়োকে রেঁধে খাওয়ানোর জন্য নিজের বউকে রেখে গেল। আর রামা ভেড়া নিয়ে বেড়িয়ে গেল।

বুড়ো বলল, "তুমি সব ভেড়া নিয়ে যাচ্ছ তবে আমি এখানে খাবটা কি? গোটা দুয়েক রেখে যাও। আমার খাবার থেকেই যা হোক কিছু ওদের খাওয়াব। যদি কোন কিছুই না জোটে তবে না খেয়ে মরব।"

বুড়োর কাছে দুটো ভেড়াকে রেখে রামাও তার জোয়ান ছেলে নিয়ে চলে গেল। কোন কোন ঘরে দু-এক জন রয়ে গেল আর কোন ঘরে কেউই রইল না। এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে তারা পথে নেমে পড়ল।

যে সামান্য কয়েক ঘর চাষী গ্রামে পড়েছিল তারা সঞ্চিত আনাজ দিয়ে মাসখানেক টিঁকে রইল; পরে তারাও চলে গেল।

বলদ নিয়ে শেকু আর তার বউও গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

ধুলো মেষপালকও গেল। গাঁয়ের চাষীরা চলে গেল। বন্ধ ঘরের দরজায় দরজায় তালা ঝুলতে লাগল।

বালা বনগরের পিঠে চড়ে কনফুসকাও গেল। যাবার সময় পাঠশালার কাছে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে গেল, "মাস্টার, আমি যাচ্ছি; কিন্তু বেঁচে থেকে ফিরে আসব আর তোমাকে দেখে নেব। আর, আমি ভালোমত জানি যে আমাকে মেরে তুমিই আমার হাত-পা ভেঙেছ।"

সকালে সন্ধ্যায় বার হওয়া এবং ফিরে আসা ভেড়াগুলি চলে গেল, জোয়ান জোয়ান মেষপালকরাও গেল আর বনগরওয়াড়ী একদম প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় ফিরে আসা শত শত ভেড়াদের সেই চেঁচামেচি হৈ চৈ আর শোনা গেল না। সারা গাঁ যেন বোবা হয়ে গেছে। ঘরের ছাতের ফাঁক দিয়ে তখন আর কোন উনুনের ধোঁয়া বের হয় না। পাঠশালার সামনে সন্ধ্যার পর আর বৈঠক বসে না। ভেড়াদের প্রস্রাব নাদের গন্ধ এখন আর ডেরাগুলিতে পাওয়া যায় না। সব শেষ হয়ে গেছে। সবাই চুপচাপ, সারা গ্রাম শান্ত।

এক বছর জল হয়নি, বর্ষার দেখা পাওয়া যায়নি, আর তাতেই বনগরওয়াড়ী গ্রাম শেষ— রামা, শেকু আনংদা কনকুসকা সব কোথায় চলে গেল।

ভাল মন্দ সবাই চলে গেল। পাঠশালা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। পড়ে রইল আখড়া, যেখানকার গাছ সেখানেই রইল। কিন্তু শুধু লোকগুলোই কোথায় চলে গেল।

জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে, সেই হাওয়ায় উড়ে পথের ধুলো ঘরের দরজায় ও দেওয়ালে জমে গেছে। মেষপালকদের

লেপাপোঁছা উঠান তাদের অবর্তমানে ধুলায় আগাছায় ভরে যেতে লাগল। তাদের সেই সব খড়মাটির তৈরী ঘরবাড়ী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। খড় বেরিয়ে পড়ল। ফাঁক দিয়ে ভিতরে হাওয়া ঢুকে অদ্ভুত শব্দ বার হতে লাগল। ঘরের বন্ধ দরজায় দমকা হাওয়া এসে আঘাত করতে লাগল। দরজায় ধড় ধড় ঘড় ঘড় শব্দ উঠল। আখড়ায় ধুলো জমল। কয়েকদিন না লেপাপোঁছার জন্য পাঠশালার দাওয়ার লাল মাটির ওপর ধুলো জমে গেল। মাকড়সা জাল বুনল। চামড়ার ঢোল ইঁদুরে কেটে দিল।

কয়েকদিন না লেপাপোঁছার জন্য পাঠশালার উঠানও নষ্ট হয়ে গেল। সেখানেও ধুলা আগাছার জঞ্জাল জমল। পাঠশালার সব কিছুতেই ধুলার পর ধুলা। হনুমানজীর মন্দিরেরও সেই অবস্থা।

গাঁয়ের কাউকেই নজরে আসছে না। রোজ সন্ধ্যায় নিমগাছের মাথায় এসে বসা বক দুটোও আর চোখে পড়ছে না। পাঠশালায় এসে কিচির মিচির করা পাখিগুলোও আর নজরে আসছে না। বিড়ালগুলি চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বন্ধ ঘরে ইঁদুর শিকার করছে। রাত্রিবেলা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করছে।

রাত্রিতে বুড়ো কাকুবার ভেড়া দুটো একলা থাকার জন্য ব্যাঁ ব্যাঁ করে চীৎকার করে চলেছে। আর শিয়ালেরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে গাঁ ঘুরে বেড়াতে লেগেছে। আখড়ার মাটির ধুলাতে মন্দিরের ধুলায় মেষপালকদের পায়ের চিহ্ন আঁকা রইল।

সকালে সেই দুটো ভেড়াকে নিয়ে বুড়ো কাকুবা ক্ষেতের দিকে বেরিয়ে পড়ত। অভুক্ত ভেড়াগুলি মাঠের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াত। নাক উঁচু করে গরম হাওয়া শুঁষত। ওদের খাবার মত

কোন কিছুই মাঠে অবশিষ্ট ছিল না। দলছাড়া হবার জন্য করুণ স্বরে কাঁদত। বুড়ো তখন ওদের সঙ্গে কথা বলত।

সারাদিন বুড়ো সেই মাঠে ঘাটে একলা ঘুরে শুকনো ঘাস পাতা যা একটু আধটু পেত তাই কোঁচড়ে করে তুলে নিয়ে ঐ দুটোকে খাওয়াত। ওরা দুজন সারাদিন একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। শেয়াল ওদের পিছু নিত। সন্ধ্যা হলেই হা – হা— করতে করতে বুড়ো ওদের দুজনকে তাড়িয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরত।

রামার বউ সকালে মাথায় খালি একটা ঝুড়ি আর কোমরে একটা খুরপি নিয়ে বেড়াত। অন্য গাঁয়ের সেচ জমিতে জমিতে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যার সময় যখন সে ফিরে আসত তখন সেই ঝুড়িতে কিছু গাঁজর থাকত। রান্নার জন্য তার কাঁধে কিছু শুকনো ডালপালা থাকত। ভেড়াদের খাবার মত ভুসিও থাকত। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে সন্ধ্যাবেলা সে ফিরে আসত। তখন কিছু সময়ের জন্য তাদের ঘরে উনুন জ্বালানো দেখতে পাওয়া যেত। কখনও কখনও কথাবার্তাও শোনা যেত।

আমি মাঝে মাঝে আমার গ্রামে যাওয়া-আসা করতাম। বনগরওয়াড়ীর এই অবস্থা আমি সব কিছু সরকারের কাছে জানাতাম। সপ্তাহে দু-চারদিন বনগরওয়াড়ী থাকতাম। বনগরওয়াড়ীতে আমরা দুজনেই থাকতাম— হাঁটু জোড় করে হাত দিয়ে চেপে বসে থাকা আয়বু আর আমি। ওর মন হলে কখনও পাঠশালা ও আখড়া ঝাঁট দিত। আমি সারাদিন শুয়ে পড়ে থাকতাম। কিন্তু লেখাপড়া করতাম। দিনে কখনও কখনও আমাকে না জানিয়ে আয়বু কোথায় চলে যেত। সন্ধ্যায় ধুলো ভর্তি পা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসত। কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞাসা

করলে শুধু বলত একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম। ব'লে আর কোন কথা বলত না। দিন তো যেমন তেমন কাটত কিন্তু রাত্রি কিছুতেই কাটতে চাইত না। এমন সময় কখনও কখনও বুড়ো কাকুবা আসত। দেওয়ালে পিঠ রেখে বসে থাকত। কামরার মধ্যে চিমনির হালকা আলো এসে পড়ত। আমি আমার চিন্তায় ডুবে থাকতাম। তিন জনে তিন দিকে বসে থাকতাম।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম, "কি কাকুবা, কোন খবর আছে? লোকজন সব ফিরবে কবে?"

"আজ্ঞে না, ফসল হলে পর সবাই ফিরবে।"— কখনও কখনও এরকম কথাবার্তা চলত। নয়তো বুড়ো অনেক ক্ষণ বসে থাকত। তারপর একসময় উঠে চলে যেত।

আমি বাড়ীর থেকে নিয়ে আসা বাসী রুটি আয়বুকে দিতে গেলে কখনও সে নিত কখনও নিতে অস্বীকার করত। বেশী আগ্রহ করে দিতে গেলে ঘরের বাইরে চলে যেত। আমি একলাই বসে বসে সেই সব শুকনো রুটি খেতাম। আর জল খেয়ে শুয়ে পড়তাম।

এরকম কিছুদিন চলার পর, সরকারী বিভাগ থেকে চিঠি এল বনগরওয়াড়ীর পাঠশালা বন্ধ করে সদর মহকুমার প্রাইমারি স্কুলে যাবার জন্য।

আয়বু আমার সব জিনিসপত্র বেঁধে দিল। ও যেখানে ছিল সে জায়গা খালি করে দিলে। পাঠশালায় তালা লাগাল, আখড়ায় তালা লাগানো হল। আমি আস্তে আস্তে কাকুবার ঘরে গেলাম। বললাম, "বাবা, আমি চললাম। সরকার আমাকে

যেতে লিখেছে।” কাকুবা আমার দিকে একটু তাকাল। মাথা নাড়ল আর বলল, “আচ্ছা।” বুড়ো বেশী কিছু বলল না। ওর বউও কিছু বলল না।

নতুন লোক দেখে ভেড়াগুলি একটু চীৎকার করল আর আমি বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

মানুষ গরু জানোয়ার কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। বনগরওয়াড়ী পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম।

বোঝায় ভরা একটা বস্তা আয়বুর মাথায়, আর-একটা বোঝা হাতে নিয়ে আয়বু আমার পিছনে আসতে লাগল। কিছু মাল-পত্তর আমার হাতে।

যেতে যেতে আয়বু একবার থেমে মাথার বোঝা ঠিক করে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, “এই বোঝাগুলি আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে ফিরে যাব।” কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই আমি জিজ্ঞাসা করলাম না।

এই বেচারীর আশ্রয় এখন কোথায় এ সব বিচার আমার মনে হ’ল না। আমার ছায়া আগে আগে পড়ছিল।

বেলা এখন বাড়ছে। আর সামনে খোলা মালভূমির উপর কোন কিছুই চোখে পড়ছে না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দগ্ধ হয়ে যাওয়া বনগরওয়াড়ীকে পিছনে ফেলে আমি এগিয়ে চললাম।

এই মারাঠী উপন্যাসের কেন্দ্র চরিত্র বনগববাড়ী। রাখাল বালকদের ছোট্ট ঐ গ্রাম। বনগববাড়ী নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ প্রাথমিক স্কুলের একটি চাকরী নিয়ে ঐ গ্রামে বাস করতে গেল। গ্রামের সুখে দুঃখে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সংগে অত ঘনিষ্ঠভাবে সে মিশে যেতে পেরেছিল। এই উপন্যাস গ্রামীণ জীবনের এক বাস্তবনিষ্ঠ আলেখ্য। গ্রামের বিচিত্র সব মানুষ আর মনোহারী প্রাকৃতিক দৃশ্যে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বেরুবার সংগে সংগে সমাদৃত হয়। কারণ, তখনও পর্যন্ত মারাঠী উপন্যাসে শহুরে শহরে মধ্যবিত্ত জীবনধারার প্রাধান্য ছিল।

ভেঙ্কটেশ মাদগুলকর ছোট গল্পের জন্য বিখ্যাত। তিনি মারাঠী গ্রাম্য জীবন ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।



ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া